শাতিল আরবে বহে শোণিত

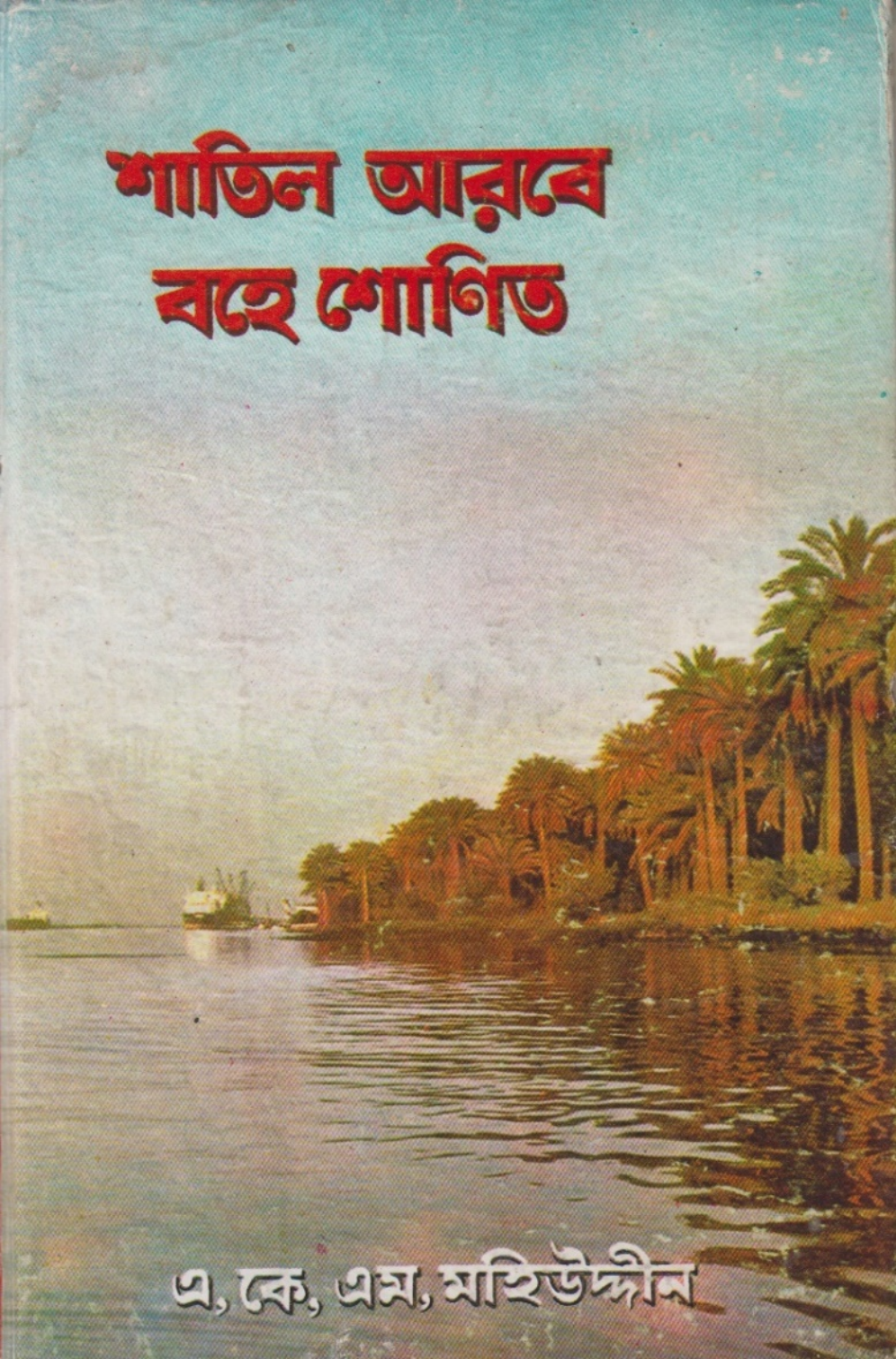

এ, কে, এম, মহিউদ্দীন

শাতিল আরবে বহে শোণিত

الدماء على شط العرب

এ. কে, এম. মহিউদ্দীন

প্রকাশক :—

এ, কে, এম, মহিউদ্দীন

২৯/১, রামপুরা (পশ্চিম)

ঢাকা-১৭

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য :—৩৫'০০

মুদ্রণ :

মদীনা প্রিণ্টার্স

৩১, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

SHATT-EL-AROBE BOHE SHONITH BY : A. K. M. MOHIUDDIN

Published by the author in December, 1983.

Price : Tk. 35·00

الدماء على شط العرب

مصنف : — اے، کے، ایم، محی الدین

ভূমিকা

সাংবাদিক হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত ও সর্বশেষ বিবরণ আমাদের অবহিত থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে ভাগ্যবিড়াম্বিত ইংরেজরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরকারীভাবে শাসন-কর্তৃত্ব গুটিয়ে নিতে শুরু করলে ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলবী যখন শাতিল আরবের তিনটি দ্বীপ এ যুক্তিতে দখল করে নেন যে, পার্শ্ববর্তী অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রের, বিশেষ করে ইরাকের পক্ষে এ দ্বীপগুলির স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে না, তখনই বিষয়টিকে একটি ভয়াবহ পরিণতির সূচনা মনে করে আমি এর ঘটনাক্রম বিশেষ সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে থাকি। তবে কথার যেমন পূর্বকথা থাকে, তেমনি ঘটনারও থাকে কারণ এবং পূর্ব-প্রস্তুতি যে বৈশিষ্ট্যের জন্য পরবর্তীতে আমাকে ইরান-ইরাকের বর্তমান সংঘর্ষের ব্যাপারে উভয় পক্ষের এবং এ দু'দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক দলিলপত্র সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। আমার এ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের ফলশ্রুতিই আজকের এ বই 'শাতিল আরবে বহে শোণিত'। বইটি সম্পূর্ণরূপে তথ্যভিত্তিক।

বইটির প্রায় সবটুকুই দৈনিক আজাদে বিভিন্ন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এ সুযোগ ও সহায়তা দানের জন্য আজাদ কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে, দৈনিক আজাদের সম্পাদক জনাব জয়নুল আনাম খাঁর নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বইটির গ্রন্থনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দানের জন্য মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ এবং মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। প্রথম সংস্করণে কিছু মুদ্রণত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পরবর্তীতে এগুলি অবশ্যই সংশোধিত হবে।

বইটি চিন্তাশীল পাঠককে বর্তমান ইরাক-ইরান বিরোধের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা দেবে বলে আমি আশা করি।

দৈনিক আজাদ,
ঢাকা।

এ, কে, এম, মহিউদ্দীন
ম্যানেজিং এডিটর

সূচীপত্র

বিষয়—	পৃষ্ঠা
ইসলামিক পপুলার কনফারেন্স	১
যুদ্ধের ময়দানে	১৪
ইরাক-ইরান যুদ্ধ	২৫
১। ইসলামিক শান্তি মিশন	২৭
২। ইরাক-ইরান সম্পর্কের অবনতি	৩০
(ক) ইরাকের প্রতিবাদ	৩২
৩। আলজিয়ার্স চুক্তি	৩৩
শাতিল আরবে থলওয়েগ লাইন	৩৮
৪। ইরানীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা	৩৯
(ক) আফ্রিকান ঐক্য সংস্থায় সাদুন হাম্মাদির পত্র	৩৯
(খ) চতুর্থ কোর কম্যাণ্ডারের নিকট সাদ্দাম হোসেনের বাণী	৪২
৫। যুদ্ধ শুরুর কাহিনী	৪৩
(ক) ইরানের আক্রমণ ও স্বীকৃতি	৪৪
(খ) ৪ঠা সেপ্টেম্বরের যুদ্ধ	৪৪
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা	৪৫
৬। খোমিনী ও তদীয় সঙ্গীদের কার্যকলাপ	৪৯
(ক) খোমেনীর ইরাকে আশ্রয় গ্রহণ	৪৯
(খ) ইরাকের প্রতি খোমেনীর বিরূপ মনোভাব	৫০
৭। যুদ্ধের ভৌগোলিক কারণ	৬৪
(ক) শাতিল আরব	৬৫
(খ) আল-জোবায়ের	৭১
(গ) কারনা	৭২
(ঘ) আমারা	৭৩

বিষয়—	পৃষ্ঠা
(ঙ) হরমুজ প্রণালী	৭৪
৮। যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি	৭৬
(ক) আবু মূসা	৭৭
(খ) গ্রেটার তাম্ব ও লিসার তাম্ব	৭৭
(গ) আল-কাসেম উপজাতি	৭৮
(ঘ) শাহ কর্তৃক ৩টি দ্বীপ দখল	৮০
৯। আরবিস্তান	৮০
(ক) আবাদান	৮৩
(খ) আল-মোহাম্মারাহ	৮৪
(গ) আরবিস্তানের ইতিকথা	৮৬
১০। ইউরোপীয়দের কার্যকলাপ	৯২
(ক) বৃটেন	৯৩
(খ) ফ্রান্স	৯৩
(গ) রাশিয়া	৯৪
(ঘ) জার্মানী	৯৫
(ঙ) ইরানে রেজা খানের ক্ষমতা লাভ ও আরবিস্তান দখল	৯৬
১১। ইরানী তৎপরতার বিরোধীতা	৯৭
(ক) নাম পরিবর্তন ও নয়া বসতি স্থাপন	৯৮
(খ) আরবীর স্থলে ফারসী ভাষা	৯৯
(গ) ইরানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ	১০০
(ঘ) খোমেনীর হঠকারিতা	১০২
১২। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ভাষণ (জাতীয় পরিষদের বিশেষ অধিবেশন)	১০৭
১৩। কনষ্টান্টিনোপল প্রটোকল	১১৭
১৪ কুর্দীদের কথা	১২৩
(ক) প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিশ্লেষণ	১২৫
১৫। খোমিনীর অভিযান	১৩৮

বিষয়—	পৃষ্ঠা
(ক) ইরাকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম	১৩৮
(খ) শাতিল আরবে আক্রমণ	১৩৯
১৬। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ঘোষণা	১৪০
১৭। যুদ্ধ ঃ বিশ্ব প্রতিক্রিয়া	১৪৩
(ক) জাতিসংঘের প্রচেষ্টা	১৪৫
(খ) ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রতিক্রিয়া	১৪৬
(গ) যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতদ্বৈধতা	১৪৭
(ঘ) ফ্রান্সের উদ্বেগ	১৪৮
১৮। শান্তি প্রচেষ্টা ঃ ইরাকের যুদ্ধ বিরতি ঃ ইরানের অসহযোগিতা ঃ যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি	১৫১
১৯। উপসংহার	১৬৬
পরিশিষ্ট	
১। কনষ্টান্টিনোপল চুক্তি (১৯১৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর স্বাক্ষরিত)	১৭১
২। তেহরান সীমান্ত চুক্তি (১৯৩৭ সালের ৪ঠা জুলাই স্বাক্ষরিত)	১৭৭
৩। আলজিয়ার্স ঘোষণা (১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চ)	১৭৯
৪। ইরাক-ইরান সীমান্ত চুক্তি (১৯৭৫ সালের ১৩ই জুন স্বাক্ষরিত)	১৮১
৫। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ঘোষণা (ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৮০)	১৮৩

ইসলামিক পপুলার কনফারেন্স

ইসলামী রাষ্ট্রসংঘের আনুকুল্যে মুসলিম রাষ্ট্রবর্গের মতপার্থক্য দূর করা, মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ঐক্য সংহত করা এবং ইরাক ও ইরানের মধ্যকার চলতি সংঘর্ষ বন্ধ করার উদ্দেশে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরে মুসলিম বিশ্বের শ্রদ্ধেয় আলেম ও মনীষীবর্গের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসের ১৪ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত।

সম্মেলনে মসজিদে নববীর ইমাম, মসজিদুল-আকসার ইমাম, দেবল শরীফের পীর সাহেব, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর, শ্রীলঙ্কা পার্লামেন্টের স্পীকার, সুদানের হাইকোর্টের বিচারপতি, সউদী বাদশাহের এডভাইজার, মো'তামার-এ-আলমের সেক্রেটারী জেনারেল এবং বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মুসলিম সমিতিগুলির প্রতিনিধি সহ বিশ্বের মোট ৫৮টি দেশের মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে ছিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজীজুল হক, মাওলানা আবদুল মান্নান এবং মওলানা মুহীউদ্দীন খান ও মাওলানা সাইফুল্লা সিদ্দীকী প্রমুখ। বস্তুতঃ এটা ছিল মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানীগুণীদের সম্মেলন, যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল সর্বপ্রকার বিভেদ ও মতপার্থক্য দূর করে বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য সংহত করা।

বিশেষ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চলতি দ্বন্দ্ব, ইসরাইলের সাথে মুসলিম শক্তিগুলির বিরোধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও অন্যান্য সম্পদ এবং তৃতীয় বিশ্ব তথা মূলতঃ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শক্তি দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে একটি মধ্যশক্তি হিসাবে মুসলিম রাষ্ট্রবর্গের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনার ফলে এই

সম্মেলনের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। তাছাড়া যেভাবে এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদল নির্বাচিত করা হয়েছিল, তাতে এই সম্মেলনের মতামত যে মুসলিম বিশ্বের মতামতের প্রতিধ্বনি ছিল, তাতে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না।

মূলতঃ এসব কারণের জন্যই বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র-শক্তি, মহাশক্তি ও শক্তি জোটগুলির সতর্ক দৃষ্টি ছিল এই সম্মেলন ও সম্মেলনের ফলাফলের প্রতি; আর এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংস্থা এবং রেডিও টেলিভিশন নেটওয়ার্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাংবাদিকগণ এসেছিলেন এই সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে। বস্তুতঃ এটাই ছিল আমারও বাগদাদ সফরের উদ্দেশ্য।

সম্মেলনের কয়েকটি সেশন এ্যাটেণ্ড করার পর যুদ্ধ ফ্রন্ট দেখার প্রস্তাব এল ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে। সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম। হোটেল মনসুর মেলিয়া থেকে আমাদের নিয়ে আসা হল বাগদাদ বিমান বন্দরে। তখন আমার সঙ্গে রয়েছেন ফ্রান্সের ছয়জন সাংবাদিক। দু'জন মহিলা, চার জন পুরুষ।

আমরা প্রবেশ করলাম বিমান বন্দরের ওয়েটিং রুমে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল নীরব নিস্তব্ধ কক্ষটিতে যেন জীবন ফিরে এল। আশপাশের কামরাগুলি থেকে বেশ কয়েকজন এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে দু'পাশের দেয়ালের দিকে গিয়ে অনেকটা সরফরাজ হওয়ার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলেন; আর এর পর পরই ঢুকলেন সাত-আট জন সুবেশধারী ভদ্রলোক। কারো হাতে সেভেন-আপ-এর, কারো হাতে ফান্টার, কারো হাতে চা অথবা কফির, আবার কারো হাতে বা সিগারেটের ট্রে। সিগারেটের ট্রেগুলিতে দেখলাম, মার্লবরো, রথম্যান কেন্ট ইত্যাকার বিভিন্ন ধরনের দামী সিগারেটের অনেক প্যাকেট আনা হয়েছে। দু'একটি প্যাকেট খুলে রাখা হয়েছে, তবে বেশীর ভাগেরই মুখ বন্ধ অর্থাৎ, এটা

আপনার পছন্দ, দু'চারটি খেতে পারেন অথবা শহরের বাইরে যখন যাচ্ছেন তখন প্রয়োজন হলে দু'চার প্যাকেট পকেটেও পুরে নিতে পারেন। বুঝলাম, সাংবাদিকদের মেজাজ বুঝেন ওরা।

কিছুক্ষণ পর ইরাকী সেনাবাহিনীর জনৈক কমাণ্ডার একান্তে এসে বসলেন আমার পাশে ; বললেন, তোমার সঙ্গী সাংবাদিকরা গতরাতে এসে পৌঁছেছেন ফ্রান্স থেকে। এরা সবাই ওয়ার করেসপনডেণ্ট। ইচ্ছা করলে এদের সাথে তুমি একেবারে যুদ্ধ ক্ষেত্রেও যেতে পারবে। এবারে তাহলে হেলিকপ্টারে গিয়ে বস। খোদা হাফেজ।

ধীরে ধীরে হেলিকপ্টারটি আকাশে উঠে গেল। ভিতরে আমরা মোট ১৪ জন। দু'জন পাইলট আর এটেনডেণ্ট ছাড়া ইরাকী গাইডরাও সঙ্গে রয়েছেন আমাদের। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, মসজিদ ই-শহুদার সুউচ্চ মিনারের গায়ে স্থাপিত বিশাল ঘড়িটায় তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা।

পাইলট তখন বাগদাদের আকাশে চক্কর দিয়ে দিয়ে শহরটা আমাদের দেখিয়ে নিচ্ছেন। বিরাট শহর, বিশাল পরিধি। যেমন পুরাতন, তেমনি বড়। উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, বেগবান দজলার দু'পাশে অসংখ্য ঘরবাড়ী। যতদুর স্পষ্ট দেখা যায়—শুধু সবুজের মেলা, এর পরেই মরুভূমি, চারিদিকে ধূ ধূ মরুভূমি। বাগদাদের আশেপাশে শাক-সব্জীর খামার রয়েছে অনেকগুলি। এসব খামার ছাড়াও বাগদাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুসারে মাইলের পর মাইল মরুভূমি এলাকায় খাদ্য সম্ভার তৈরীর চেষ্টা চলছে। দজলা থেকে খাল কেটে এসব এলাকায় পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গড়ে উঠেছে সবুজের সমারোহ। হেলিকপ্টারে বসে নীচের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলাম পুরাতন ইরাকের নবীন প্রচেষ্টার ফল সবুজের মেলা।

এক মনে দেখছিলাম সবুজের সমারোহে মরু হাওয়ার উদ্দাম মাতামাতি। কানে ভেসে এল মেয়েলী কণ্ঠ, "ডীন ইউ হ্যাভ লষ্ট ইউরসেলফ্"।

নজর ঘুরিয়ে দেখি ফরাসী সাংবাদিক মিস জেন কথা বলছে। আমাকেই বলছে, "তুমি হারিয়ে গেছো।"

উঠে গিয়ে কাছে বসলাম। বললাম, জেন হারিয়ে যেতে আমার ভালই লাগে। যাবে নাকি তুমিও! খুব একচোট হাসল মেয়েটি। বলল, সে ভাগ্য কি আমার হবে ডীন। দেখোনা, প্যারিস থেকে বাগদাদে এসেছি যুদ্ধের বিবরণ সংগ্রহ করতে এটা কি আমার কাজ. তুমিই বলো! তোমাদের দেশে আমার বয়সী মেয়েরা কি করে?

কিছুটা সান্তনার সুরেই বললাম, বুঝেছি জেন, ওয়ার করেস্‌পনডেন্ট হিসাবে এটা তোমার হাতেখড়ি। সভ্যতার যে অভিশাপে পড়েছ তা থেকে তোমাদের আর নিষ্কৃতি কোথায়।

সিগারেট এগিয়ে ধরল জেন। বললাম, না হবে না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বললাম, হয় তুমি আমার সিগারেট খাও, না হয় চলুক বৃটীশ ষ্টাইল—অর্থাৎ, যার যার তার তার ব্যবস্থা। হঠাৎ বীরাঙ্গনার ভঙ্গীতে সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল জেন। কোমরে হাত রেখে চোখ পাকিয়ে বলল, খাবে কিনা আমার সিগারেট?

ইরাকী গাইড মোহাম্মদ ইয়াছিন দৌড়ে এলেন ওপাশ থেকে। দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, দোহাই তোমাদের, চলতি হেলিকপ্টারে গোল বাঁধিও না। গ্রাউণ্ডে নেমে যা ইচ্ছা করো, কিচ্ছু বলব না। অপাততঃ এই নাও, দু'জনেই আমার সিগারেট খাও। চকলেটও দিতে পারি, খাবে?

শুরু হল হাসাহাসি। কপ্টারের এটেনডেন্টসহ সবাই হাসছে। এভাবেই আমাদের হাল্কা হাস্যরসের মাঝে হেলিকপ্টার এগিয়ে চলল যুদ্ধ ফ্রন্টের দিকে।

হেলিকপ্টারটি এক সময় মিশান সামরিক ঘাঁটিতে এসে পৌছল। মাটিতে পা রাখতেই কয়েকজন সামরিক অফিসার এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। খেজুর গাছের সারি দূরে দেখা গেলেও ঘাঁটিটি মরুভূমিতেই

অবস্থিত। মরু হাওয়া তখন জোর বইছে। বলতে কি দাঁড়িয়ে থাকাও তখন প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। বাতাস ছিল তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা।

সামরিক ঘাঁটি বলতে আমরা যা বুঝি মিশান সামরিক ঘাঁটির পরিবেশ মনে হল তার চাইতেও অনেক মারাত্মক। অনেক ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার, জীপ এদিক সেদিক সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিমান বিধ্বংসী কামান উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। বালুর বস্তা দিয়ে এখানে সেখানে ঢিবি আবার কোথাও কোথাও বা দেয়াল তৈরী করা হয়েছে। বাংকার করা সর্বত্র। সদা প্রস্তুত সৈন্যরা অস্ত্রহাতে এ বাংকার সে বাংকার থেকে মাঝে মধ্যেই মাথা উঁচিয়ে আমাদের দেখছে, আবার নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গতিক বড় সুবিধার লাগল না। মনে হল, সামান্যতম ভুলবুঝাবুঝিতে অনেক যত্নে লালিত এ দেহটা যে কোন মুহূর্তে বালুতে লুটিয়ে পড়তে পারে।

হেলিকপ্টারের দিকে চাইতেই বড় মায়া হল। মনে হল, এই অনাসৃষ্টির রাজ্যে হেলিকপ্টারই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু ফিরে যাওয়ারও তো সুযোগ নাই, পড়েছি মোগলের হাতে।

একজন উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, "ছাহাফী ব্রাদার্স এণ্ড সিষ্টার্স, আপনারা সবাই আমাকে অনুসরণ করুন।" ইরাকী গাইডরাও দুম্বা তাড়ানোর মত আমাদের সুশৃঙ্খল করতে করতে বললেন, "চলুন, চলুন।" কিন্তু চলবটা কোথায়। সর্বত্রই যে দেখি কেবল ট্যাঙ্ক, কামান আর বাংকার। কিন্তু তবুও যেতে হবে। সুতরাং মনের ভাব গোপন রেখে বাংকারগুলির পাশ ঘেষে সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তের দিকে।

মরুভূমির উপর পথ চলা মোটেই সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। বিশেষ করে বাংকারগুলির পাশ দিয়ে যাওয়াটা ছিল খুবই কষ্টকর। বালু ধ্বসে যে কোন মুহূর্তে বাংকারে অবস্থানরত সশস্ত্র সৈনিকটির ঘাড়ের উপর

পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তা ছাড়া কে জানে কি সব রেখেছে ওখানে। যদি বিস্ফোরক কিছুর উপর গিয়ে পড়ি।

টাল সামলে অনেকক্ষণ হাটলাম। প্রায় ক্লান্ত হয়ে এসেছি এমন সময় দেখি সামনের বালুর বস্তার দেয়ালটির মাঝামাঝিতে গিয়ে আমাদের পথ প্রদর্শক সামরিক অফিসারটি ঠায় দাঁড়িয়ে গেছেন। আমরা গিয়ে সেখানে জড় হতেই তিনি "ব্রাদার্স এণ্ড সিষ্টারস, ওয়ান বাই ওয়ান প্লিজ" বলে ছয়টি বস্তার আকারের এক ফোকর গলে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আমরাও অনুসরন করলাম তাঁকে। ভিতরে গিয়ে দেখি, ছোট একটি একতলা দালান। বাইরের দিকটি সিমেন্ট রংয়ের, ভিতরে গোলাপী প্লাষ্টার। সারাটা মেঝে সহ জানালা পর্যন্ত নানা বর্ণে মোজাইক করা। বেশ সুন্দর, পরিপাটি, ছিমছাম। করিডোর ধরে এগিয়ে চললাম। এ ঘর সে ঘর করে শেষ পর্যন্ত একটি ছোট হল ঘরে পৌঁছলাম। কার্পেট, সোফা, টেলিফোন, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদিতে ঘরটি সাজান। দেয়ালে দেখলাম খোদাই করে একটি কবিতা লিখে রাখা হয়েছে। গাইডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই আরবীতে লেখা কবিতাটির তিনি ইংরেজী তরজমা করে বুঝিয়ে দিলেন। ওটা হল কাদেসিয়ার যুদ্ধ অবলম্বনে যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টিকারক আরবদের বীরত্বগাঁথার একটি অংশবিশেষ।

আমরা আসন গ্রহণ করতেই এয়ার কণ্ডিশনার চালিয়ে দেয়া হল; এল ফ্রিজের পানি, ফান্টা, কোক এবং সব শেষে চা, কফি ও সিগারেট। খাওয়া শেষে সিগারেট ধরাতেই সঙ্গী সামরিক অফিসারটি দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন; আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। মিশান সামরিক ঘাঁটির সর্বাধিনায়ক তিনি। চেহারা-সুরত সব দিক থেকেই তাঁকে বেশ উপযুক্ত লোক বলে মনে হল। বুঝাই গেল মন তাঁর অন্যত্র নিবিষ্ট। আন্তরিকতার সাথে করমর্দন করলেন সবার সাথে। আসন গ্রহণ করেই বললেন,

"সাংবাদিক বন্ধুরা, বাগদাদ থেকে অনেকক্ষণ হল আপনারা রওয়ানা হয়েছেন। সম্ভবতঃ আপনারা ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। তবে, আপনারা এখন ফাক্কাহ সেক্টরের মূল সামরিক ঘাঁটিতে রয়েছেন যেখানে ক্লান্তির কোন অবকাশ নাই। কিন্তু ক্ষুধার দাবী মিটাতেই হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আপনাদের কি দিয়ে অপ্যায়ন করবো। তবে, একজন ভাইয়ের দাবী উপেক্ষা করবেন না বলেই জানি। আসুন, যা তৈরী আছে তা দিয়েই আজকের লাঞ্চটা আমার সাথে সেরে নিবেন।"

অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার, সুন্দর কথাবার্তা। এগিয়ে গেলাম কোণের দিকটার ডাইনিং হলে।

একটি করে আরবদের বিশেষ প্রিয় রুটি ছুম্মুন, এক পেয়ালা তরকারী এক থালা সালাদ, আর এক গ্লাস করে দুধ রাখা হয়েছে প্রত্যেকের জন্য ডাইনিং টেবিলে। ডিস ভর্তি ভাতও আছে। সাদা মিহি চালের ভাত। প্রয়োজন মোতাবেক নিয়ে নিন।

সৈনিকদের এই ডাইনিং টেবিলেই ছুম্মুন নামক রুটির প্রথম সাক্ষাত পেলাম। ছুম্মুনকে আরবরা কেবল ভালইবাসেনা অত্যন্ত মর্যাদাও দেয়। এক টুকরা ছুম্মুন কোথাও পড়ে থাকতে দেখলে যে কোন আরব তা তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে সযত্নে উঠিয়ে রাখবে।

পেয়ালার তরকারীতে ছিল খাসীর গোশত, ঢেড়স ও টমেটো; আর সালাদে ছিল লেটুস পাতা, শশা, টমেটো ও পেয়াজ।

খাওয়া শেষে সোফায় গা এলিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কথা শুনছিলাম আর মাঝে মধ্যে কেউ না কেউ দু'একটি প্রশ্ন করে খুঁটিনাটি জেনে নিচ্ছিলাম। এবারে তিনি বলছিলেন যুদ্ধের অবস্থা। যুদ্ধ হচ্ছে আসলে মিশান থেকে সীমান্তের দিকে আরো ৭০ কিলোমিটার দূরে। বললেন, আমাদের এই যে সতর্ক অবস্থা দেখছেন এর প্রধান কারণ হল এই যে, বিশেষ করে এখান থেকে সীমান্তের দিকে সারা এলাকাটিতেই আমরা এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করেছি আত্মরক্ষার জন্য। আমরা

আক্রমণ করতে চাই না, তবে আক্রান্ত হলে ডিফেন্স নিতে হবেতো? মিশান ঘাঁটির অনেকটা এলাকা আপনাদের এখানে আনার পথে দেখিয়ে আনা হয়েছে। তবে, বাগদাদ থেকেও ম্যাসেজ পেয়েছি, আপনারা নাকি ফ্রন্টের দিকে আরও এগিয়ে যাবেন?

হৈ হৈ করে উঠল মেম জেন ও তার মহিলা সঙ্গী মিস এলিস। মিস এলিস প্যারিসের একটি মহিলা পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করছেন। আকারে ছোট, ছিপছিপে টুং টাং করে অনর্গল কথা বলছে আর সুযোগ পেলেই এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরঘুর করছে ঠিক আমাদের দেশের নেংটি ইঁদুরের মত।

ভীষণ উৎসাহ ওদের। হৈ হৈ করে দু'জনে যা বলল তার অর্থ হল —ব্রিগেডিয়ার, আমাদের এক্ষুণি ফ্রন্টে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, না হলে আবার রাত হয়ে যাবে, সব কিছু দেখতে পাবনা।

হাসলেন ব্রিগেডিয়ার। বললেন, চলুন তাহলে আপনাদের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করে দেই। হেলিকপ্টারে যাওয়া ঠিক হবে না, গুলীতে ভূপাতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিগ্রেডিয়ারের অফিসের পিছনের দরজা দিয়ে বেরুতেই দেখি, একদম পীচ ঢালা রাস্তা। অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। মেটে রংয়ের একটা মাঝারী সাইজের মাইক্রোবাসে সবাইকে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন ব্রিগেডিয়ার। গাড়ী এগিয়ে চলল তিব-এর পথে।

অনেকক্ষণ চলার পর বাম দিকে একটি সরু রাস্তা দেখা গেল। এটাকে ঠিক রাস্তা বলা চলে না, বলতে হয়, মরুভূমির উপর দিয়ে ট্যাংক ও লরী চলার চাকার দাগে চিহ্নিত অংশ। কয়েকটি ট্যাংকের পাশ কাটিয়ে আমাদের মাইক্রো ঢুকে পড়ল এই সরু পথ ধরে। কিন্তু কিছুটা এগোতেই বাধা এল। লোহার শিকল টেনে পথ রোধ করে কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। গাইডদের একজন জানালার কাঁচ

নামিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'ছাহাফী', ফ্রাসিয়া, বাংলাদেশ।" সঙ্গে সঙ্গে শিকলটা মাটিতে পড়ে গেল এবং সৈন্যরা স্যালুট দিয়ে অভিনন্দন জানাল। এবার আমাদের গাড়ী এগিয়ে চলল সম্পূর্ণ অনির্ধারিত পথে, মরুভূমির উপর দিয়ে, বাংকারের পাশ ঘেষে, এঁকে বেঁকে।

মাইক্রোবাসটি যখন থামল আমরা তখন একটি বার-চৌদ্দ ফুট উঁচু মাটির ঢিবির সামনে। নামতেই মাটির ঢিবি থেকে ছোট একটি দরজা খুলে গেল। সহাস্যে বেরিয়ে এলেন কাল পোষাক পরা একজন কর্ণেল। বুঝলাম, তিনি এখানকার ট্যাংক বাহিনীর অধিনায়ক।

কর্ণেলকে বেশ সপ্রতিভ মনে হল। স্বাগত জানিয়েই জেন আর এলিসের দিকে পর পর হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুখে বললেন, "লেডিজ ফার্ষ্ট।" লেডিজদের অনুসরণ করে আমরাও মাটির ঢিবির ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

ঢুকেই দেখি, অবাক কাণ্ড! নীচে কাঠের ফ্লোর। উপরে কাঠের ছাদ। দেওয়ালগুলিও কাঠের। সুন্দর, রং করা। আমাদের দেশের লেটেষ্ট ষ্টাইলের হোটেলের হল ঘরগুলির মত। সোফা, টেবিল, টেলিফোন, টেলিভিশন সব কিছুই আছে। বাইরের বিভীষিকার চাইতে এ ঘরটি সত্যি আরামের। তবে, এয়ারকণ্ডিশনার থাকা সত্বেও বেশ গরম মনে হল। হল ঘরে ঢুকতেই অপর একজন কর্ণেল আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রথম কর্ণেল পরিচয় করিয়ে দিলেন দ্বিতীয় জনকে তিব ঘাটির অধিনায়ক বলে।

অধিনায়ক কর্ণেল আমাদের নিয়ে বসলেন। চা, কফি, কিছু নাশতা আর সিগারেট এল। খেতে খেতে আলাপ হল। কর্ণেল বললেন, আপনারা এখন যুদ্ধ এলাকার মাঝামাঝিতে রয়েছেন। আসার পথে নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের প্রস্তুতি ও সতর্কাবস্থা দেখেছেন। এটা এজন্য যে, যে কোন মুহূর্তে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। বিমান আক্রমণ

হতে পারে, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হতে পারে, এমনকি ট্যাংক যুদ্ধও হতে পারে। তবে সামনাসামনি যুদ্ধের আশঙ্কা কম। যে সেক্টরে আপনারা এখন আছেন এর পরিধি হল দৈর্ঘে ৩২ মাইল। এই ৩২ মাইলের যে কোন স্থানে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।

মিস জেন আর মিস এলিসের চোখ ততক্ষণে বড় বড় হয়ে আসছে। আমাদের গলাও শুকিয়ে আসছে নিজের অজ্ঞান্তেই। অনেকেই সামনে রাখা ফান্টা ও কোকে দু'চার চুমুক দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। মনে হল কর্ণেল বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। বললেন, তবে ছাহাফী ভাই বোনেরা, আপনাদের উদ্বেগের কোন কারণ নাই। আপনারা ইরাকের ভূমিতেই রয়েছেন এবং ইরাক তার এক ইঞ্চি ভূমিও শত্রুদের ছেড়ে দিবে না। গত রাতের যুদ্ধের কথাই ধরুন না। আজ সকালে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে। এ যুদ্ধে আমরা ১৪ হাজার ইরানী সৈন্য খতম করেছি এবং জীবন্ত পাকড়াও করেছি পাঁচশত। আর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ যে কত আয়ত্বে এনেছি তা না দেখলে অনুমান করতে পারবেন না। আপনারা দেখতে চাইলে সবই দেখতে পারেন।

জনৈক ফরাসী সাংবাদিক বললেন, কর্ণেল, ইরানীদের এত ক্ষয়-ক্ষতির কথা বললেন; আপনাদের দিকের ক্ষতির বিষয়েও কিছু বলুন না!

কর্ণেল বললেন, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার আয়ত্বের বাইরে। আমি দুঃখিত।

বললাম, যুদ্ধ মোট কত ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল?

বললেন, ধরুন না, গতকাল বিকাল থেকে শুরু হয়ে সারা রাত ধরেই চলেছে।

বললাম, কর্ণেল, এপর্যন্ত যা দেখেছি তাতে আপনাদের প্রস্তুতি ও দক্ষতা সম্পর্কে আমার বেশ উঁচু ধারণা জন্মেছে। তবে, আধুনিক যুদ্ধের যে রূপ ও প্রকৃতি তাতে একটি মাত্র যুদ্ধে বিপক্ষের ১৪ হাজার সৈন্য হত্যা করার বিষয়টি কিভাবে সম্ভব হল?

কর্ণেল বললেন, হাঁা, এ প্রশ্নটি আপনি করতে পারেন। কথাটি কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয় বৈ কি। তবে ইরানীদের যুদ্ধের কায়দা দেখলে আপনারাও না হেসে থাকতে পারতেন না। ওরা এতই অদক্ষ যে, পঙ্গপালের মত হর হর করে সব ঢুকতে থাকে। আসলে ওরা ঠিক সৈনিক নয়। আধা-দক্ষ ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী। তাছাড়া আমরা তো ওদের এলাকায় যাইনি। ওরা এদিকে কনসেনট্রেশন করেছিল।

বললাম, কর্ণেল, তাহলে কথাটি বোধ হয় আমরা এভাবে বলতে পারি; ইরানী বাহিনী আপনাদের এলাকা দখল করে নিয়েছিল এবং সেখানে দখল স্থায়ী রাখার চেষ্টা করছিল, আপনারা তা পুনরুদ্ধার করতে গেলে এই যুদ্ধ শুরু হয়। তাহলে আপনারা নিজেদের সবটুকু জায়গা পুনরায় দখল করতে পেরেছেন কি?

কর্ণেল হেসে ফেললেন। বললেন, আচ্ছা, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। ওরা যে ফাকাহ সেক্টরে আক্রমণ চালাবে সে খবর আমরা আগেই পেয়েছিলাম এবং প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবস্থাও নিয়েছিলাম। ওরা সীমান্ত অতিক্রম করে আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়তেই আমরা ডান ও বাম দিকে সরে গিয়ে তাদের এগিয়ে আসার সুযোগ দেই। ওরা আমাদের এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার ঢুকে শমিদাহ অঞ্চলের পাহাড়গুলিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টা করা কালে আমরা ওদের আক্রমণ করি। আর লোকক্ষয়ের যে প্রশ্নটি আপনি তুলেছেন ওটা সম্ভব হয়েছে ইরানীদের এয়ার কভারেজ না থাকায় এবং আমরা গানশিপ ব্যবহার করেছি বলে।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কর্ণেল। মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, কিছু মনে করবেন না কর্ণেল, গানশিপ জিনিষটা কি? আর ইরানীরাই বা এয়ার কভারেজ দিল না কেন, জানেন কিছু?

বললেন, গানশিপ হলো, এই ট্যাংকের কথাই ধরুন না কেন ; তবে ওটা আকাশেও উড়তে পারে আর সার্চ লাইট দিয়ে খুঁজে খুঁজে নীচে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গুলী ছুড়তে পারে। গত রাতের যুদ্ধে গানশিপ আমাদের খুবই কাজে এসেছিল। আর ইরানীদের এয়ার কভারেজের কথা বলেছেন, তা তো প্রায় বছর খানেক ধরেই নাই। ওরা নিজেরাই মারামারি করে মরেছে!

বললাম, সত্য কথাই বলেছেন, কর্ণেল। তবে, যুদ্ধ যদি আজ সকালেই শেষ হয়ে থাকে, তাহলে কিছু আলামত তো এখনো দেখা যেতে পারে!

কর্ণেল বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে, তা দেখতে হলে আপনাদের ফাকার দিকে আরো অন্ততঃ ৪০ কিলোমিটার এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ, শমিদার পাহাড়গুলিতে। মানে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে যেখানে সব কিছু এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার হয়ে আছে। ওখানকার পরিস্থিতি তো খুবই কঠিন, যাবেন আপনারা ওখানে!

আমাদের চাইতেও মেয়েদের মনোবল দেখলাম আরো কঠিন। এলিস তো তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। বলল, এক্ষুণি কর্ণেল, উই আর রেডী। কর্ণেল বললেন, তাহলে চলুন। আপনাদের আনা গাড়ীতে আর এগোনো যাবে না। আমি গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সৈনিককে কিছু বলে কর্ণেল আমাদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

মরু হাওয়া তখন এখানেও ভীষণ জোরে বইছে। আমরা সবাই বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটি মাইক্রোবাস ধীরে ধীরে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। আকারগত সাদৃশ্য আর জানালার কাঁচগুলি না থাকলে এটি যে মাইক্রোবাস তা বুঝার কোন উপায় ছিল না। কাদা মাটিদিয়ে লেপেমুছে সব একাকার করে দেয়া হয়েছে। মাইক্রোটিকে মনে হচ্ছে

যেন কাদার একটা বড় ঢেলা। আমাদের বিদায় জানিয়ে অধিনায়ক কর্ণেল অপর কর্ণেলকে বললেন, আপনি ওদের সঙ্গে যান, সতর্ক থাকবেন সব সময়, ওদের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখবেন।

পরিবেশটা কেমন যেন কিছুটা ভারী ভারী মনে হল। মিস জেন এগিয়ে এসে কানে কানে বলল, ডীন, অবস্থাটা কিন্তু আমার খুব সুবিধার লাগছে না, গাড়ীতে আমি তোমার পাশে বসবো। বললাম, বসো। মাইক্রো এগিয়ে চলল ফাকাহ সেক্টরের দিকে।

গাড়ীতে সবাই চুপচাপ বসে আছেন। কেউ কথা বলছেন না। সবাই যেন ভাবছেন। কে কি ভাবছেন, কে জানে। নীরবে সিগারেট টানতে টানতে আমিও ভাবছিলাম এই ইরাক-ইরানের কথাই। কিন্তু আমার এই তন্ময়তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। সম্বিৎ ফিরে পেলাম মিস জেনের কনুইয়ের গুঁতায়। জেন বলছে, দেখ, দেখ, ঐ যে গানশিপ। বিরক্ত হয়ে বললাম, ধেৎ, কে বললে তোমাকে ওটা গানশিপ? জেন বলল, জিজ্ঞেস কর না হয় কর্ণেলকে। কর্ণেল ড্রাইভারের পাশেই বসে ছিলেন। আমাদর কথা শুনতে পেয়ে বললেন, মিস জেন ঠিকই বলেছেন। ওটা দেখতে অনেকটা ট্যাংকের মত, আবার দেখুন পাখাও রয়েছে; ফলে মাটিতে ও আকাশে দ্রুতগতিতে চলতে সক্ষম। বডি ইস্পাতের হওয়ায় ট্যাংকের মত ওটাকে ঘায়েলও করা যায় না। অথচ ওটা নিজে সার্চ লাইট মেরে শত্রুকে খুঁজে বের করে উপর থেকে এবং অবশ্য মাটিতে থেকেও ঘায়েল করতে পারে।

বেশ কয়েকটি গানশিপ দেখলাম দূরের পাহাড়গুলির দিকে মুখ রেখে ষ্ট্যাণ্ডবাই করিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলির পাশেই আবার কয়েকটি বিমান বিধ্বংসী কামান।

আমাদের গাড়ী এক সময় বাম দিকে ঢাল বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল। মোটামুটিভাবে আমরা সবাই প্রায় ঘাবড়ে গেলাম। আমরা ভেবেছিলাম, হয়ত বা বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাই নিরাপত্তার জন্য

এই ব্যবস্থা। কিন্তু কর্ণেল আমাদের আশ্বস্ত করে জানালেন যে, দূরের পাহাড়গুলিতে আমাদের উঠতে হবে এবং এর জন্য প্রথমে আমাদের পাহাড়গুলির গোড়ায় পেঁছিতে হবে। কর্ণেল বললেন, আমরা ফাক্কাহ সেক্টরে পেঁছে গেছি।

অনেক নীচে নেমে গাড়ী সমান্তরাল চলতে শুরু করলে কর্ণেল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে লাগলেন, বন্ধুগণ ডান দিকে চেয়ে দেখুন অনেক ছোট ছোট ঢিবির মত দেখা যাচ্ছে, আর ওই দিকে দেখুন কয়েকটি গাড়ী রয়েছে, লোকজন কাজ করছে। ঢিবিগুলি হল মৃত ইরানী সৈনিকদের কবর আর ওদিকে নিহত ইরানীদের কবর দেওয়া হচ্ছে। আমরা হয়ত বা নিহতদের প্রতি কর্তব্য পুরোপুরি পালন করতে পারছি না, কিন্তু যথাসম্ভব সম্ভ্রম বজায় রাখছি।

মিস এলিস ততক্ষণে পিছন থেকে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন। বলছেন, আমার দিকের জানালায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, মাটি দিয়ে সব বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জনৈক ফরাসী সাংবাদিক তাকে ইশারায় নিজের কাছে ডেকে নিলেন। দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, এই ছাখো।

কর্ণেল বলে চললেন ফ্রেণ্ডস্, এবারে রাস্তার দু'পাশে, অবশ্য যদি আপনারা এটাকে রাস্তা বলে স্বীকার করেন, দেখুন, অসংখ্য কাঠির মত কিছু দেখা যাচ্ছে। এর আশ-পাশেই মাইন পোতা আছে। এগুলি আমরাই পুতে রেখেছি নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। ইরানীরাও এই এলাকায় মাইন পুতেছে, তবে সেগুলি আরো পরে দেখতে পাবেন। গাড়ী এগিয়ে চলল মাইন ফিল্ড আর কাঁটা তারের উঁচু বেড়ার পাশ দিয়ে।

যুদ্ধের ময়দানে

এভাবে আরো কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে ক্রমে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। একটির পর একটি পাহাড় অতিক্রম করে পাহাড়ের রাজ্যে যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ করছি

মন যেন ততই দুর্বল হয়ে আসছে। আরো একটু এগিয়ে যেতেই মনে হল বাংলাদেশ দূরে থাকুক বাগদাদেও বোধ হয় আর ফিরে যাওয়া হবে না। পথের মাঝেই একটি ট্যাংক মুখ থুবরে পড়ে আছে, যাচ্ছে তাই বিশ্রী চেহারা নিয়ে। কোন ট্যাংক যে এভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যেতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এর পর যতই এগুচ্ছি দেখছি ট্যাংক, মেশিনগান এখানে সেখানে পড়ে আছে, আশে পাশে পড়ে আছে শশ্রু মণ্ডিত মৃতদেহ। এক জায়গায় এসে গাড়ী থেমে গেল। কর্ণেল বললেন, নেমে আসুন।

গাড়ী থেকে নামতেই দেখি নারকীয় কাণ্ড-কারখানা। অগুনতি মৃতদেহ পড়ে আছে এখানে সেখানে। কোনটি চীৎ হয়ে আছে, কোনটি কাত হয়ে, আবার কোনটি উপুড় হয়ে। এক জায়গায় দেখলাম, একটি সৈনিক রক্তস্নাত হয়ে পড়ে আছে। ইন্তেকালের আগে যে হাত পা, ছুড়েছিল রক্তের সে দাগ পর্যন্ত রয়ে গেছে।

এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে। ঐখানে একটি মেশিন গানের উপর উবু হয়ে পড়ে আছে একটি সৈনিক। আহা, বেচারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গুলী ছুড়েছে।

এবারে যে অবস্থায় এসে পৌছলাম তা আরো ভয়াবহ। সামনে, ডানে, বামে, পিছনে শুধু পরিত্যক্ত অস্ত্র-সস্ত্র আর লাশ। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে এখনো দুই একটি জীপ থেকে ধূয়া উড়ছে। আগুন এখনো সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়নি। কোথাও কোথাও মাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গর্ত হয়ে গেছে। গুলী ভর্তি বহু বিরাট বিরাট বাক্স পড়ে আছে। একটি পোড়া মৃতদেহের পাশেই পড়ে আছে তার খাবার।

থামতে হল আমাদের। কর্ণেল বললেন, সাবধান, সাবধান, আর এগুবেন না। দাঁড়িয়ে গেলাম সবাই। জেনের দিকে চেয়ে দেখি তার সাদা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আতঙ্ক তার চোখে-মুখে।

এলিস ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ফিস ফিসিয়ে বলল, একটু পানির ব্যবস্থা করবে ভাই? তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, একটু অপেক্ষা করো, এক্ষুণি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমাদের দাঁড় করিয়েই কর্ণেল চীৎকার করে আরবীতে কি যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফুড়ে বেরিয়ে এল বেশ ক'জন সৈনিক। কর্ণেল আরো কিছু বলতেই তারা এসে ফাঁসীর আসামীর মত আমাদের প্রত্যেককে দু'জনে দু'হাতে ধরে এক লাইনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। লাইনে দাঁড় করাল বটে কিন্তু হাত ছাড়ল না। একজন ধরেছে ডান হাতে অন্যজন বাম হাতে। বেশ শক্ত মুঠোয় ধরেছে তারা। মনে হল আমরা বুঝিবা পালিয়ে যাব। এলিসের দিকে চোখ যেতেই একটি সৈনিককে ইশারা করলাম। সৈনিকটি বুঝল। নিজের বোতল খুলে পানি খাওয়াল এলিসকে।

কর্ণেল বললেন, সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাকে মাফ করবেন। এরূপ ব্যবস্থা ছাড়া আপনাদের জান বাঁচানোর এখন আর অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে এসে আপনারা এখন দাঁড়িয়েছেন এর সবটাই মাইন-ফিল্ড। মাইন আমরা এখনো পরিষ্কার করতে পারিনি। শুধু মাত্র একটা পায়ে হেটে চলার নিশ্চিত রাস্তা বের করেছি। অসাবধানে পা একটু এদিক সেদিক পড়লে আর রক্ষা নাই, ইরানীদের মতই উড়ে যাবেন আপনারাও। সৈনিকদের সাথে এগিয়ে যান। ওরা রাস্তা জানে। কোন ভয় নাই। ওই যে দেখা যায়, লাল কাপড়ের দেওয়া চিহ্নটুকু পর্যন্ত যেতে হবে। আশে পাশে দেখতে দেখতে যাবেন। আপনাদের এপথে আনার কারণ হল, এখানে সব কিছুই যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে। এগুলি সরাবার সময় করে উঠতে পারি নাই এখনো। দেখুন কি অবস্থা।

দেখব কি আর! দেখার মত মানসিক অবস্থা তখন আর কারো ছিল না। সবাই যেন সংযত, সংহত, নিশ্চুপ। মিস জেন, পিছু পিছু আসছিল দু'জন সৈনিকের সহায়তায়। ফিরে দেখি, বিষাদ ক্লিষ্ট আনত-নয়নে নীচে বালুর দিকে চেয়ে সে ধীরে ধীরে আসছে।

আমারও কোন দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু তবুও দেখছিলাম। নিষ্প্রাণ ইস্পাতের সব অস্ত্রশস্ত্র, গুলী, বোমা, মর্টার, গ্রেনেড আর নওজোয়ানদের মৃতদেহ। এই যে পায়ের কাছে লাশটি। কিছুটা বিকৃত হয়ে এসেছে চেহারা। কিন্তু বেশ বুঝা যায়, বড় সুন্দর ছিল ছেলেটি। গোঁফও গজায়নি ঠিক মত। লালচে ঠোঁটের উপর শুধু দেখা যায় গোলাপী আভা।

নিজেকে সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। ইরাকী হোক, ইরানী হোক, সবই যে আমার ভাই। ধরা গলায় আওয়াজ বেরিয়ে এল, এনাফ কর্ণেল এনাফ। পিছন থেকে কর্ণেলের আওয়াজ ভেসে এল, গো এহেড প্লীজ।

লাল নিশানাটি পর্যন্ত যেতেই সৈনিক দু'টি হাত ছেড়ে দিয়ে পাঁচ সাত হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। থেমে গেলাম। আমাদের গাড়ীও ততক্ষণে দূর দিয়ে ঘুরে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই জড় হতেই কর্ণেল বললেন, ওঠে বসো। মিস জেন এবারও আমার পাশেই বসেছে। চেয়ে দেখি, ওর চোখ দুটি গোলাবের মত লাল। কেঁদেছে নাকি মেয়েটি।

গাড়ী ষ্টার্ট দিতেই কর্ণেল বললেন, ঐ চূড়াটি পর্যন্ত যাব আমরা। আমাদের সৈনিকদের শেষ অবস্থানস্থল পর্যন্ত। ফ্রন্ট লাইন এখানেই শেষ। এর পরবর্তী সমতল ভূমির পরে যেখানে একটি জীপ থেকে এখনও ধোঁয়া উঠতে দেখছেন ওখানকার উঁচু বালুর তৈরী বাঁধটিই হল ইরাক ও ইরানের সীমারেখা। ইরানীদের আমরা সীমান্তের ওপারে হটিয়ে দিয়েছি।

কর্ণেল বলেই চললেন, ওই চূড়াতে গাড়ী রেখে আমরা নীচে সমতল ভূমিতেও কিছুটা যাব। গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক লাশ নীচে পড়ে আছে।

অতএব শেষ চূড়াতে গিয়ে গাড়ী থামতেই যে যার মত নেমে কর্ণেলের নেতৃত্বে এগিয়ে চললেন। আমিও নামছি। সবেমাত্র ডান পা মাটিতে রাখতেই জেন হঠাৎ আমার বাম হাতটা চেপে ধরল। চোখে-মুখে রাজ্যের মিনতি জানিয়ে বলল, তুমি যেও না।

যাহোক, অনেক বুঝিয়ে গাড়ী থেকে নামিয়ে আনলাম ওকে। সঙ্গীরা সবাই তখন অনেক নীচে নেমে গেছেন আর কতিপয় সশস্ত্র সৈন্য চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জেন ততক্ষণে বসে পড়েছে মাটিতে। সে যাবে না। আমাকেও যেতে দেবে না।

মাঝারী বয়সের একজন সৈনিক তখন দু'পা এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, সালাম। আমিও একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, ওয়াসসালাম।

আমার বুক পকেটের উপর আটকানো ইরাক সরকারের দেয়া কার্ডটি পড়ে সৈনিকটি যেন খুশী হয়ে উঠল। বিস্ময় ভরা খুশীতে সে বলল, সাহাফী, বাংলাদেশ, মুসলিম।

বললাম, বাংলাদেশী মুসলিম, আখুন।

যেন চরম পাওয়া পেয়ে গেল সৈনিকটি। পরিবেশ, ভেদাভেদ সব ভুলে গিয়ে ধূলি মাখা গায়েই সে জাপটে ধরল আমাকে। বারে বারেই শুধু বলতে লাগল, ইয়া আখি, ইয়া আখি, আহলান সাহলান।

জড়াজড়ি থেকে মুক্ত হয়েই চেয়ে দেখি জেন অবাক হয়ে দেখছে আমাদের। বললাম, মিস জেন, এরা সবাই মুসলিম, আমার ভাই।

খুশীর ছোঁয়া যেন লেগে গেছে সবার মনে। একজন এগিয়ে এসে আমাকে সিগারেট অফার করল। অপর একজন দৌড়ে গিয়ে এক পাশে বালুতে অর্ধপোতা একটি গ্রেনেড এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, আখি, গ্রেনেড, ইরান, টেক ইট। অর্থাৎ, এটা ইরানীদের গ্রেনেড, নিয়ে যাও ভাই। বললাম, গ্রেনেড নো গুড, টেক ইট অর্থাৎ, এটা গ্রেনেড? না ভাই এটা ভাল জিনিস নয়, নিয়ে যাও। হাসির রব উঠল যুদ্ধক্ষেত্রেও।

সৈনিকদের সাথে আলাপ করছি, যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে। বাম দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এগুলি সবই ইরাকী এলাকা। পাহাড়ের পরে আধা কিলোমিটারের কম হবে সমতল ক্ষেত্র। এর পরেই উভয় দেশের সীমানা। দূর থেকে মাঝে মধ্যে সমতল এলাকাতেও ধোঁয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে। সৈনিকদের যে দু'একজন দু'চারটি করে ইংরেজী শব্দ জানে তারা নিজেদের সব জ্ঞান আর দৈহিক ভাবভঙ্গী দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছিল সব কিছু।

জিজ্ঞেস করলাম, ইরানী সৈন্যদের কথা। তাদের সংখ্যা, শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে তারা কিছু জানে কিনা। মাঝ বয়েসী সেই সৈনিকটি তখন ডান দিকে শ' খানেক গজ দূরের একজনকে চীৎকার করে কি যেন বললেন। মেশিন গানের মত দেখতে একটি যন্ত্রের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই সৈনিকটি তখন দূরবীন দিয়ে সীমান্তের দিকে কি যেন দেখছিল আর অস্ত্রটির পজিশন ঠিক করছিল। আওয়াজ পেয়েই দূরবীন হাতে সে এক ছুটে চলে এল। ইরানীদের অবস্থান সম্পর্কে তাকে বলতেই সে আমার চোখে দূরবীন লাগিয়ে বলতে লাগল. সি দ্যাট, ব্ল্যাক, ইরানী। দ্যাট ব্ল্যাক মেশিনগান, দ্যাট সাইড হিল। বুঝলাম, সে আমাকে দেখতে বলেছে—ওই যে কাল কাল ফিগার দেখা যাচ্ছে ওগুলো ইরানী সৈন্য, আর পাহাড়ের দিকে কাল রেখার মত ক্ষীণ যেগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো ওদের মেশিনগান ইত্যাদি।

নিবিষ্ট মনে দেখছিলাম, স্পষ্ট কিছু দেখা যায় কিনা। এমন সময় বাম দিকে বেশ কিছু দূরে মরুর নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটা বিকট আওয়াজ হল, বুম-ম-ম। দূরবীন নামিয়ে চকিতে সেদিকে চেয়ে দেখি সীমান্তের ওপারে ইরানী এলাকায় বিরাট আকারের একটি ঘন কাল ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে ক্রমে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারলাম-

না কি হল। উপস্থিত সবাই তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেদিকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। পর পর আরো দু'টি গগণভেদী শব্দ পাহাড়গুলিতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল—বুম-ম-ম, বুম-ম-ম।

বুঝতে পারলাম, ইরাকীরা যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাম দিকের পাহাড় থেকে ইরানীদের কামান দাগছে। প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, কি করি এখন! ডান দিকে চাইতেই মাথা যেন আরো গুলিয়ে গেল। দূরবীন হাতের সে জওয়ান তখন শক্ত হাতে অস্ত্রটির হাতল টেনে ধরে আছে আর আগুনের গোলার মত লালচে সাদা কি যেন ফুরফুর করে তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। এক সেকেণ্ডে যে কত বেরুচ্ছে আলেমুল গায়েবই জানেন। সীমান্তের ওপারে চাইলাম। হাঁ, সবই গিয়ে ওখানে পড়ছে; আর দ্রিম দ্রিম বিকট আওয়াজে আগুনের উল্কাসহ ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

কোন উপায় নাই, সম্পূর্ণ অসহায় আমি, কি করব, কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারছি না, নিঃশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছে। চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম, শুধু জেন চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। চারদিকে আর কেউ নাই, কোথায় যেন হাওয়ায় মিশে গেছে সব।

এরি মধ্যে ইরানীদের গোলা এসে পড়তে লাগল ডান দিকে। বুম্ বুম্ করে ফাটছে সব জওয়ানটির ডান পাশের উঁচু জায়গাতে। দিশা-হারা আমার তখন যা হয় একটা কিছু করে ফেলার অবস্থা। শক্ত মুঠিতে জেনকে ধরে যখন প্রায় দৌড় দিব দিব ভাবছি, এমন সময় দূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল—ষ্ট্যাণ্ড বাই, কামিং যেও না আসছি। নীচের দিকে চেয়ে দেখি কর্ণেল আর সঙ্গীরা প্রাণপণে দৌড়ে আসছেন উপরের দিকে। কি যে অবস্থা আমার তখন। এক এক সেকেণ্ড যেন মনে হচ্ছে কত দিন! হাত পা ছেড়ে বসে পড়লাম জেনের পাশে শমিদার পাহাড় চূড়ায়।

পহাড়ের চূড়ায় উঠতে উঠতে কর্ণেল দ্রুত হাতের ইশারায় বলছিলেন, জলদি গাড়ীতে উঠ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। গায়ে যে তখন এত

শক্তি কোথা থেকে এসেছিল, কে জানে। কোন কথা না বলে, জেনকে জাপটে ধরে গাড়ীতে ছুড়ে দিয়ে নিজেও এক লাফে উঠে বসলাম। ততক্ষণে দমাদম সবাই উঠতে শুরু করেছে। ড্রাইভার ষ্টিয়ারিং ধরে রেডী হয়েই ছিল। দরজা লাগানোরও সময় ছিল না। সাঁ করে আমাদের মাইক্রো তীব্র গতিতে এগিয়ে চলল। ফ্রন্ট লাইন ছেড়ে।

শমিদাহ অঞ্চলের প্রায় সবটাকেই মোটামুটিভাবে পাহাড়ী এলাকা বলা চলে। পাহাড়গুলি বেশ উঁচু, তবে মাটির পাহাড়। আমাদের সীতাকুণ্ড এলাকার পাহাড়গুলিতে গাছ গাছড়া একেবারে না থাকলে যা দাঁড়ায়, মোটামুটিভাবে তাই। তবে পার্থক্য হল সীতাকুণ্ড এলাকার পাহাড়ের সারি যেমন একটি দু'টি এবং স্থান বিশেষে কয়েকটি, সেখানে শমিদাহ এলাকার সবটাই পাহাড়ের সারিতে ভরপুর। কেবল দৈর্ঘ্যেই নয় প্রস্থেও পাহাড় ছাড়া এলাকাটিতে সমতল ক্ষেত্র বড় একটা নাই। তাছাড়া আমাদের সীতাকুণ্ড এলাকায় কেবল পাহাড়ই নয়; আশপাশের সমতলভূমিতেও একই ধরনের মাটি। কিন্তু শমিদার পাহাড়ের গোড়া থেকে পরবর্তী বিস্তৃত সবটুকুই বালুকাময়, মরুভূমি অর্থাৎ, মরুভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে শমিদার সারি সারি মাটির পাহাড়।

শমিদার সমতল ভূমিতে এসে গাড়ী কিছুটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। এটা সেই পুরাতন মাইন ফিল্ডের এলাকা যা আমরা শমিদার পাহাড়ে উঠার আগে অতিক্রম করে গেছি। এটা ইরাকীদের ডিফেন্স লাইন। এখানকার রক্ষা ব্যবস্থা দেখার মত। জায়গাটির পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে পাহাড়। আমরা পশ্চিম দিকের পাহাড় থেকে নেমে এসেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানটির ত্রিকোণাকৃতি দৃষ্টি এড়ায় না। পশ্চিম দিকের পাহাড়ের গোড়ায় যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু দেখা যায় কাঁটাতারের উঁচু বেড়া। এই বেড়ার পাশ ঘেঁষে প্রায় দু'শ হাত প্রস্থে সৃষ্টি করা হয়েছে ঘন পোতা মাইন ফিল্ড।

কর্ণেল বললেন, এই এলাকাটির সামরিক গুরুত্ব খুবই বেশী। আপনারা নিশ্চয়ই হয়ত বা মনে করছেন, এই কাঁটা তারের বেড়া আর মাইন ফিল্ড পার হতে পারলে সমতল মরুভূমি দিয়ে শত্রুপক্ষ আমাদের দেশের অনেক অভ্যন্তরে চলে আসতে পারবে। কিন্তু না, তা হবার নয়। ডান দিকের পাহাড়গুলিতে লক্ষ্য করুন, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের জওয়ানরা কিভাবে সদা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

পাহাড়ের চূড়া থেকে দৃষ্টি নীচে আসতেই একটু বিস্মিত হলাম, এখানকার মাটি অথবা বালুও বলা যায়, কাল কেন! ঠিক এ ধরনের মাটি, মনে পড়ল, কুয়েতেও দেখেছি। সব জায়গায় নয়, জায়গা বিশেষে। তবে, ইরাকের চেয়ে কুয়েতে এ ধরনের মাটির এলাকা সম্ভবতঃ বেশী। এ ধরনের মাটি গত কয়েকদিনে অনেক জায়গায় দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য, কিভাবে এ বৈশিষ্ট্যটুকু একেবারেই লক্ষ্য করিনি। আমার তখনকার অবস্থায় বিপদতাড়ন বলতে একমাত্র কর্ণেল সাহেব। অতএব তারই শরণাপন্ন হলাম। কিন্তু জবাব যা দিলেন তাতে বুঝলাম, এ ব্যাপারে আমি কিছু না বুঝেও তাঁর চেয়ে কম বুঝি না। তিনি যা বুঝালেন তার সারমর্ম হল যে, শক্ত মুঠিতে এ মাটি চেপে ধরতে পারলে তেলের জন্য ডিপোতে যেতে হবে না।

যাহোক, কাল হোক, সাদা হোক আমাদের তখন এসব নিয়ে সময় নষ্ট করার মত অবস্থা নয়। আমরা শুধু দেখছিলাম ট্যাংক, মেশিনগান, বাংকার আর মরুভূমি।

ফিরতি পথ, সুতরাং অবস্থা একই। তবে একটা নতুন বিষয় লক্ষ্য করলাম। আমরা যখনই সৈন্যভর্তি ট্রাকগুলি অতিক্রম করছিলাম, তখন তারা তুমুল আনন্দধ্বনিসহ হাততালি দিচ্ছিল। এটা কি আমাদের আগমনের কথা তারা জেনেছিল বলে? কিন্তু তা মোটেই সম্ভব ছিল না। হয়ত বা যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্র ও যোদ্ধা ছাড়া নতুন কিছু দেখাতেই তারা

আমাদের সম্বন্ধে একটা উঁচু ধারণা নিয়ে ফেলেছিল। এ অবস্থা চলেছিল আমারার পার্শ্ববর্তী দজলা নদীর প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত। এরপর তিবের পথে না গিয়ে আমাদের গাড়ী কর্ণেলের নির্দেশ মত দ্রুত এগিয়ে চলল মিশানের পথে। কারণ, সূর্য তখন মরু-দিগন্তের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

আমাদের গাড়ী যখন ব্রিগেডিয়ারের বালুর বস্তা ঘেরা দালানের পিছন দিকে গিয়ে থামল, মিশানের আকাশ তখন সম্পূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন। ভাবলাম, বুঝিবা বৃষ্টি হবে। কিন্তু ব্রিগেডিয়ারের কামরায় ঢুকেই বুঝতে পারলাম সে গুড়ে বালি।

আমরা ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। করমর্দন করলেন সবার সাথে। সবাইকে বসিয়ে নিজে বসলেন। এরপর হেসে বললেন, আপনারা যে এদিকে এগিয়ে আসছেন সে খবর আমি অনেক আগেই পেয়েছি। কিন্তু আপনারা যে আজ যেতে পারবেন না!

শারিরীক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই আমরা এখন বিপর্যস্ত। সুতরাং চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল সবার। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে চাইলাম তাঁর দিকে। স্মিত হাসলেন ব্রিগেডিয়ার। বললেন, আচ্ছা রাখুন দেখি। এরপর নিজেই টেলিফোন করা শুরু করলেন একের পর এক। মুখে বললেন, আবহাওয়া অফিসের রিপোর্ট, বৃষ্টি নয়, তবে ঝড় উঠতে পারে। অতএব হেলিকপ্টার উড়ানো যাবে না। আচ্ছা দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়। না হয় দ্রুতগামী গাড়ীর ব্যবস্থা করে দেই, যদি না থাকতে চান এখানে। গাড়ীতে যাবেন আপনারা?

মিস এলিস ততক্ষণে লাফিয়ে ব্রিগেডিয়ারের শোবার বিছানায় উঠে বসেছে। কোলের কাছে বালিশ টেনে নিয়ে কৃত্রিম রাগের ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে বলল, জনাব ব্রিগেডিয়ার সাহেব, প্লেনে হোক, গাড়ীতে হোক, যা হয় একটা কিছুতে করে জলদি বাগদাদ পাঠানোর ব্যবস্থা

করুন ; না হয় আপনার ওই টেলিফোনের দিব্বি, বিছানা ছেড়ে নড়ছি না একটুকুও। সিগারেট পর্যন্ত খাব না।

এলিসের বিছানায় উঠে বসা আর ব্রিগেডিয়ারকে শাসানোর ভঙ্গিতে হাস্যরোল উঠল ছোট্ট কামরাটিতে। ইতিমধ্যে কফি আর সিগারেট এসে গেল। কাপে চুমুক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পরিমাপ করে নিলাম কামরাটির অবস্থা।

মিশান মূল ঘাঁটির অধিনায়কের কামরা। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৮ ফুট ও ১২ ফুটের মত হবে। এক কোণে সব যন্ত্রপাতি রাখা। ছোট একটি টেবিল। কয়েকটি টেলিফোন। একটি টেলিভিশন, সোফা সেট, বেশ কয়েকটি চেয়ার ও একটি গদি আঁটা বিছানা, যা এলিস ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছে।

অধিনায়কের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হল। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, আমরা থেকে গাড়ী আসছে, ততক্ষণে আপনারা একটু ক্লান্তি দূর করে নিন। টেলিভিশন খুলে দিলেন তিনি নিজেই। এরপর সবার মুখোমুখি হয়ে বসলেন। বললেন, শুনলাম ফ্রন্টে গিয়েছিলেন আপনারা। বলুন দেখি, কি রকম দেখলেন? জেনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনার কি ধারণা? যুদ্ধ খুবই সাংঘাতিক ঘটনা, কি বলেন?

কিচ্ছু বলল না মিস জেন। শুধু দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মাটির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "মাই গড"। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তব্ধ কামরায় মিস এলিসের বিষণ্ণ কণ্ঠও বেজে উঠল, "হোয়াই দিস ওয়ার", কেন এই যুদ্ধ?

কেন এই যুদ্ধ, এই ছোট্ট অথচ মারাত্মক প্রশ্নটির জবাব প্রসঙ্গেই "শান্তির আরবে বহে শোণিত" বইটি লেখা হয়েছে। বইটি সম্পূর্ণরূপে তথ্যভিত্তিক। গবেষণলব্ধ এ বইটিতে পাঠক প্রশ্নটির সুস্পষ্ট জবাব পাবেন।

ইরাক ইরান যুদ্ধ

ইসলামিক শান্তি মিশন

ইরাক ও ইরানের বর্তমান যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। পশ্চিমা শক্তিবর্গসহ জাতিসংঘ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পক্ষ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জোর প্রচেষ্টা চালান হয়েছে। কিন্তু সুফল আসেনি কোনটিতেই।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও শান্তি প্রচেষ্টা জারি রয়েছে এবং এই প্রচেষ্টা চলছে ইসলামী শান্তি মিশনের মাধ্যমে।

উপসাগরীয় যুদ্ধে অস্ত্র সংবরণের প্রশ্নে ইরাক ও ইরান সরকারের সাথে আলোচনার জন্য ইসলামী শান্তি কমিটির পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল বিগত ৭ই মার্চ ১৯৮২ রবিবার সকালে জেদ্দা থেকে বাগদাদ পৌছেন। গিনির প্রেসিডেন্ট আহমদ সেকুতুরের নেতৃত্বাধীন এ প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, তুরস্কের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বুলন্দ উলুসু ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল হাবিব শাত্তি।

প্রতিনিধি দলটিকে খোশ আমদেদ জানান ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহা মহিউদ্দীন, বিপ্লবী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইজ্জত ইবরাহীম ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ। প্রতিনিধি দলটি এর পর ইরান পৌছলে তেহরান বিমানবন্দরে ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী, প্রধানমন্ত্রী মীর হোসেন মুসাভী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর বেলায়েতীসহ ইরানের পদস্থ সামরিক অফিসারগণ তাঁদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

ইরাক ও ইরানের নেতৃবর্গের সাথে আলোচনার পর ইসলামী শান্তি কমিটি ৯ই এপ্রিল ১৯৮২ মঙ্গলবার সন্তোষের সাথে উল্লেখ করেন যে, উভয় পক্ষই ইসলামী সম্মেলন-সংস্থা ও ইসলামী শান্তি কমিটির কাজে তাদের দ্ব্যর্থহীন আস্থা ব্যক্ত করেছে। তাঁরা পরিষ্কারভাবে

আভাস দিয়েছেন, ইসলামী শান্তি কমিটির মাধ্যমেই বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। ইসলামী শান্তি কমিটির এই অভিমত কমিটির বৈঠক শেষে জেদ্দায় প্রকাশিত এক ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছিল যাতে বিরোধের মূল বিষয় হিসাবে সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ইশতেহারে বলা হয়, ইরাকের মতে সৈন্য প্রত্যাহার অবশ্যই আলোচনার পর হতে হবে। কিন্তু ইরান চায়, আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই সৈন্য প্রত্যাহার করা হোক।

বিরোধীয় পক্ষদ্বয়ের এরূপ অনমনীয় মনোভাব গ্রহণের প্রেক্ষিতে ইসলামী শান্তি মিশন একটি নয়া কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শান্তি মিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, প্রস্তাবিত কমিটি একটি অভিন্ন শান্তি আদর্শিকা গ্রহণের বিষয়ে উভয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে, এমনকি প্রয়োজনে চাপও সৃষ্টি করবে এবং কমিটির কাজের ফলাফল পর্যালোচনা করার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কয়েকজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

ইরানের এই সর্বশেষ ষ্ট্যাণ্ড অনেকটা নির্ভরযোগ্য স্থানের সন্ধানে সীমিত পরিমণ্ডলে সতত: ভ্রমণরত দাবা খেলার অসহায় রাজার বেহাল অবস্থার মত হয়ে গেছে। কারণ, মাত্র সেদিন ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী যথাসাধ্য কুটনৈতিক দূরদর্শীতা প্রয়োগ করে ইসলামী শান্তি কমিটির নিকট দাবী জানিয়েছিলেন যে, ইরাক ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হলে যুদ্ধ কে শুরু করেছিল তা প্রথমে নির্ণয় করতে হবে।

এ দাবী উত্থাপন প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী নিঃসঙ্কোচে বলেন যে, একমাত্র এ প্রশ্নের সমাধানের মাধ্যমেই এ যুদ্ধের গোড়ার কথা উদঘাটিত করা যাবে এবং কে যুদ্ধাপরাধী তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

কুটনৈতিক সূত্রে এ খবর পেয়ে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইসলামী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান গিনির প্রেসিডেন্ট আহমদ সেকুতুরের

নিকট ১৫ই মার্চ ১৯৮২ তারিখে এক পত্র লিখেন। পত্রে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনার ও ইসলামী শান্তি কমিটির আমাদের দেশ সফর ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমাদের দেশ ও জাতির নেতৃত্বে নিয়োজিত আমার সহকর্মীদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ। ইসলামের সুমহান আদর্শ ও আন্তর্জাতিক নীতিমালার ভিত্তিতে ইরাক ও ইরানের মধ্যে বিরাজমান সশস্ত্র বিরোধ মীমাংসার বিষয়ে আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করছি। আমরা আশা করি যে, এ মহান প্রচেষ্টায় আল্লাহ আপনাদের সহায়তা করবেন।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট, ইতিমধ্যে প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী আপনার নিকট বিগত ১২ই মার্চ তারিখে লিখিত পত্রে যুদ্ধের সূচনাকারী তথা আক্রমণকারীর না-কামিয়াবীকে যুদ্ধ অবসানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রস্তাবিত শান্তি এরূপ ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তবভিত্তিক হতে হবে, যাতে তা যুদ্ধবাজদের নিরুৎসাহিত করবে। এতে যুদ্ধের আগুন চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হবে।

আমরা আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আলী খোমেনীর এই বক্তব্যের সাথে আমরাও সম্পূর্ণ একমত। এজন্য মুসলিম জাতিগুলো এবং আন্তর্জাতিক জনমতের সাথে বাস্তবতাকে জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা একটি প্রস্তাব পেশ করছি যে, আপনাদের কমিটি কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হোক। এ কমিটি যুদ্ধ কে শুরু করেছে, তা নির্ণয় করবে এবং যুদ্ধের সূচনা সংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন করবে। অনুরূপভাবে আমি আশা করব যে, আপনারা আমাদের এ প্রস্তাব ইরান সরকারের কাছে পেশ করবেন। হয়ত বা আপনাদের স্মরণ আছে, ইরান সরকার ইতিপূর্বে এরূপ একটি কমিটি গঠনের দাবী জানিয়ে-

ছিলেন এবং গত বছর বাগদাদ সফরকালে আপনারা নিশ্চয়ই বিষয়টি অবগত হয়েছিলেন। সে সময় আমরা প্রস্তাবটি অনুমোদনও করেছিলাম। ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে আপনার নিকট প্রেরিত পত্রে আমরা জোর দিয়ে বলেছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে, ইরান সরকার প্রকাশ্যে এবং সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন যেন মুসলিম জাতিগুলো ও আন্তর্জাতিক জনমত ইরাক ও ইরানের মধ্যে বিরাজমান সশস্ত্র বিরোধের কারণজনিত জটিল পরিস্থিতি সম্যকরূপে অবগত হতে পারেন।"

প্রেসিডেনট সেকুতুরের নিকট লিখিত প্রেসিডেনট সাদ্দাম হোসেনের এ পত্রের বিবরণ বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও অবিকলভাবে প্রকাশিত হয়। এ পত্রের বিবরণ পাওয়ার পর পরই প্রেসিডেনট খামেনী স্বীয় দাবীর ব্যাপারে একেবারে খামোশ হয়ে যান।

লক্ষ্যযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট আলী খামেনীর সৈন্য প্রত্যাহারজনিত দাবী ইরানের দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারে সারবত্তাহীন নয়। কিন্তু কথা হল এই যে, প্রেসিডেন্ট খামেনী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধী সংক্রান্ত স্বীয় দাবীর ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন কেন? ইরাক ও ইরানের মধ্যে কে প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, এ বিষয়টি নির্ণয় করার কি কোন প্রয়োজন নেই? অন্ততঃ ইতিহাসের বিকৃতি পরিহার করার জন্য হলেও এ প্রশ্নের সমাধান হওয়া প্রয়োজন এবং এ সত্য নির্ধারণ করতে হলে ১৯৮০ সালের গোড়ার দিককার অথবা তারও কিছু পূর্বেকার ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ইরাক-ইরান সম্পর্কের অবনতি

এই পর্যালোচনায় যে বিশেষ দিকটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে তা হল এই যে, ইরানী নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর তেহেরান প্রত্যাবর্তনের পর,

এমনকি তারও কিছু আগে থেকেই ইরান ও ইরাকের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। এ অবস্থায় এটা অনুমিত হচ্ছিল যে, চলতি ধারা অব্যাহত থাকলে ইরাক ও ইরানের মধ্যে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধকে কিছুতেই এড়ানো সম্ভব হবে না। অথচ পর্যবেক্ষকদের নিকট বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল যে, ইরানী বিপ্লবের নেতারা ফিলিস্তিনীদের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন এবং ইরানের শাহের কার্যকলাপের বিরোধিতা করে শাহ কর্তৃক উপসাগরীয় এলাকা দখলের বিষয়টিকে কিভাবে সমর্থন করছিল।

বিশেষ করে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর তেহরান প্রত্যাবর্তনের পর ইরানী বিপ্লবের যে প্রকৃতি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাতে প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একটি শান্তিময় পরিবেশ আশা করেছিল এবং এটাও বিশেষভাবেই অনুভূত হচ্ছিল যে, ইরানের শাহ কর্তৃক সৃষ্ট উপসাগরীয় এলাকার বিরোধেরও একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু অচিরেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শাহ যে উদ্দেশে মধ্যপ্রাচ্যে আরও একটি ঘোলাটে পরিবেশ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, আয়তুল্লাহ খোমেনী প্রকৃতপক্ষে সে উদ্দেশ্যের মূল পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ হিসাবে কাজ করে চলেছেন। ফলে, শাহের পতনের কারণে ইরানের বিপ্লবী নেতাদের আভ্যন্তরীণ নীতির যাই হোক না কেন, ইরানের সীমানা সম্প্রসারণ নীতির মোটেই কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ইরানী নেতৃবৃন্দ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, শাহ ইতিপূর্বে যেসব এলাকা স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন, সেসবই ইরানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। কেবল তাই নয়, তারা এমনকি ইরাকসহ কতিপয় উপসাগরীয় দেশকেও ইরানের অংশ হিসাবে দাবী উত্থাপন করে বসেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইরানী বিপ্লবের এই জোশ কেবল কথায় পর্যবসিত থাকেনি, এর ফলে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে, প্রতিবেশী দেশ ইরাকের

সীমান্তে বিরোধজনিত দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে চলে। হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৯ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮০ সালের ২৬ শে জুলাই তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে স্থল, বিমান ও সমুদ্র পথে ইরানী বাহিনী ২৪৪ দফা কেবলমাত্র ইরাকের সীমানাই অতিক্রম করে। এছাড়াও ছিল ইরাকের সীমান্ত চৌকি আক্রমণ, পাহারাদারদের আটক করে নিয়ে যাওয়া এবং শাতিল আরবে ইরাকের ও অন্যান্য বিদেশী জাহাজগুলোকে আটকে রাখা ইত্যাকার আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক কার্যকলাপ।

ইরান বিনা বাধায় একের পর এক উস্কানিমূলক কাজ করে চলেছিল একথাও অবশ্য সত্য নয়। তবে যারা তাদের সংস্পর্শে বাধ্য হয়ে এসে পড়েছিল, তারা সবাই ইরানের এ ধরনের কাজে প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একমাত্র ইরাকী কর্তৃপক্ষই বাগদাদে অবস্থিত ইরানী রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে ২৪০ বার এ ধরনের আক্রমণাত্মক কার্যাবলীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ইরাকের প্রতিবাদ

এসব প্রতিবাদলিপির প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গেলে ১৯৮০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের বাগদাদস্থ ইরানী রাষ্ট্রদূতের নিকট অর্পিত ইরাকী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবাদলিপিটি উল্লেখ করা যায়।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, ইরানের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে আমরা কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণটি হল যে, ইরানের আভ্যন্তরীণ কুয়াশাচ্ছন্নতা ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি ও ভ্রান্ত হিসাব-নিকাশের ফলে ইরানী নেতৃবৃন্দ হয়তোবা এটা এখনো উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি যে, ইরান সত্য সত্যই ইরাকী সীমান্ত অতিক্রম করে ইরাকের অনেক ভিতরে অনুপ্রবেশ করেছে। এটা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির খেলাফ এবং ইরাক ও ইরানের মধ্যে ১৯৭৫ সালে সম্পাদিত আলজিয়ার্স চুক্তির বিরোধী। ঘটনা সত্য হয়ে থাকলে সীমান্তের

অবস্থা, চুক্তির বিষয়াদি ও আমরা যা বলেছি সে বিষয়ে কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নির্দেশ দিতে আমরা ইরানী নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাই। ইরানী নেতৃবৃন্দকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দেশের অভ্যন্তরে ইরানী অফিসারগণ যেভাবে উপভোগ করেছেন, বেসামরিক জন-অধ্যুষিত মান্দালী ও খানাকীনের দু'টি শহর আক্রমণ করার বিষয়টি তেমন সহজ ও উপভোগ্য কিছু নয়। ইরাকের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত জঘন্য এবং ইরাকের সাথে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটাতে না চাইলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অবশ্যই রোধ করতে হবে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা না হলে আপনারা আল্লাহ, ইরানী জনগণ ও বিশ্ব জনমতের নিকট দায়ী থাকবেন।

আলজিয়ার্স চুক্তি

প্রসঙ্গত: আলজিয়ার্স চুক্তির কথা এসে যায়। সীমান্ত ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের বিষয়ে ইরাক ও ইরানের মধ্যে এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৩ই জুন তারিখে। চুক্তিতে ইরাকের পক্ষে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদী এবং অপরপক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আলী খালাতবারী।

কিন্তু ১৩ই জুন তারিখে স্বাক্ষরিত হলেও চুক্তিটির ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চ তারিখের আলজিয়ার্স ঘোষণায় এবং তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির তথা ওপেকের শীর্ষ সম্মেলন ছিল এই ঘোষণার পটভূমি। আলজিরিয়ার রাজধানীতে ওপেক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণরত ইরানের শাহ এবং ইরাকের বিপ্লবী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের তদানীন্তন ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীন উপসাগরীয় এলাকায় নিজেদের বিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণে সম্মত করেন। তদনুসারে

এই উভয় নেতা দু'বার মিলিত হন এবং দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। এ আলোচনায় আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীনও অংশগ্রহণ করেন। আলোচনাকালে উভয় নেতা এলাকাগত অবিভাজ্যতা, সীমান্ত বিরোধ ও একে অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা বিষয়ক নিজেদের সব সমস্যার চূড়ান্ত ও স্থায়ী সমাধান নির্ণয়ের কাজে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান।

ইরানের শাহ ও ইরাকের সাদ্দাম হোসেন এই আলোচনাকালে সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন যে, ১৯১৩ সালের কনষ্টানটিনোপল প্রটোকল ও ১৯১৪ সালের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যবিবরণী অনুসারে উভয় দেশের স্থল-সীমান্ত বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হবে, নদী সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করা হবে থালওয়েগ লাইন অনুসারে, উভয় পক্ষ যৌথ সীমান্তের বিষয়ে পারস্পরিক আস্থার ভাব বজায় রাখবে এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে কোন অনুপ্রবেশকারীই এই চূড়ান্ত মীমাংসার কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে না পারে।

উভয়পক্ষ এ আলোচনায় আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, কোন পক্ষ থেকেই এ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করার কোনরূপ চেষ্টা করা হবে না এবং উভয় পক্ষই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীনের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

ইরানের শাহ এবং ইরাকের সাদ্দাম হোসেন তখন আরও স্বীকৃত হয়েছিলেন যে, নিজেদের সম্পর্কের বিরোধী ভাবগুলোকে দূর করে উভয় পক্ষ অতঃপর নিজেদের ঐতিহ্যগত প্রতিবেশীসুলভ ও ভ্রাতৃসম্পর্ক বজায় রাখবে এবং ভারসাম্যগত সহযোগিতা বৃদ্ধির ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করবে।

তাছাড়া উক্ত আলোচনায় এরূপ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল যে, আলজিরীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ইরাক ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণ পরবর্তী

১৫ই মার্চ তারিখে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়ে বর্তমান আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শাহ্ ও সাদ্দাম হোসেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকেই শাহ ইরাক সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং এটাও স্থিরীকৃত হয়েছিল যে, ইরাকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আহমদ হাসান আল বকরও পরবর্তী কোন এক সময়ে ইরান সফর করবেন।

এই আলোচনার সূত্র ধরেই উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ইরানের শাহের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আলী খালাতবারী ও ইরাকের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদীকে মনোনীত করা হয়।

আলজিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল আজিজ বুতেফ্লিকার উপস্থিতিতে এই উভয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বলা হয় যে, উভয় দেশের সীমানা ইরাক, ইরান ও আলজিরিয়া কর্তৃক গঠিত একটি মিশ্র-কমিশন নিম্নোক্ত ভিত্তিতে নির্ধারণ করবেন।

১) ১৯১৩ সালের কনষ্টান্টিনোপল প্রটোকল এবং ১৯১৪ সালের তুরস্ক-পারস্য সীমান্ত কমিশনের সভার কার্যবিবরণী।

২) ১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চের তেহরান প্রটোকল।

৩) ১৯৭৫ সালের ২০ শে এপ্রিল তারিখে বাগদাদে অনুষ্ঠিত পর-রাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও ১৯৭৫ সালের ৩০ শে মার্চে তেহরানে স্বাক্ষরিত স্থলসীমান্ত নির্ধারণ কমিটির রেকর্ড।

৪) ১৯৭৫ সালের ২০ শে মে তারিখে আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের দলিলপত্রাদি।

৫) ১৯৭৫ সালের ১৩ই জুনে ইরাক ও ইরানের মধ্যে স্থল সীমানা নির্ধারণকারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্থলসীমানা চিহ্নিতকরণ সম্বলিত বিস্তারিত দলিল পত্রাদি।

৬) ১: ৫০,০০০ স্কেলে প্রস্তুতকৃত স্থলসীমান্ত লাইন সম্পর্কিত মানচিত্রাবলী এবং পুরাতন ও নয়া সীমানা-চিহ্ন।

৭) পুরাতন ও নয়া সীমানা চিহ্নের রেকর্ড কার্ড।

৮) সীমানা চিহ্নের সমন্বয়কারী দলিলপত্রাদি।

৯) পুরাতন ও নয়া সীমানা-চিহ্ন প্রদর্শিত বিমান থেকে তোলা ইরাক ও ইরানের সীমান্ত এলাকার চিত্রাবলী।

চুক্তিতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, সীমানা নির্ধারনের এই কাজ দু'মাসের মধ্যে সম্পাদন করা হবে। চুক্তিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে :

১ : ২৫,০০ স্কেলে সীমানা-চিহ্ন সম্বলিত নয়া মানচিত্র তৈরী করার জন্য উভয় পক্ষ ইরাক ও ইরানের স্থলসীমান্ত সম্পর্কিত বিমান থেকে তোলা চিত্র সংগ্রহে সহায়তা করবে এবং এ কাজটি ১৯৭৫ সালে ২০ শে মে থেকে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে। তাছাড়া এই নয়া মানচিত্র পূর্ববর্তী মানচিত্রের স্থলাভিষিক্ত হবে।

এই মানচিত্রের মাধ্যমে বিস্তারিত রেকর্ডকৃত লাইন মোতাবেক ইরাক ও ইরানের স্থল-সীমান্ত চিহ্নিত হবে এবং একই বরাবরে আকাশ এবং আন্তঃভূমির সীমানাও নির্ণিত হবে।

এ ব্যবস্থানুসারে যে সব সম্পত্তির মালিকানা বদলে যাবে, সেগুলির মূল্য একটি ইরাক-ইরান যুক্ত কমিশন প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণয় করবে এবং এতদসম্পর্কিত দাবীগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দুই মাসের মধ্যে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।

উভয় দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি যুক্ত কমিশন সীমানা চিহ্নগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন ও সেগুলি পরীক্ষা করে দেখবেন। বছরে একবার এ কাজটি করা হবে এবং তা করা হবে সেপ্টেম্বর মাসে। তবে

কোনও এক পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হলে নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও সীমান্ত পর্যবেক্ষণের কাজ করতে হবে এবং তা অনুরুদ্ধ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

এভাবে নির্মিত সীমানাচিহ্নগুলি রক্ষার দায়িত্ব চুক্তিভুক্ত উভয় পক্ষের উপর ন্যাস্ত থাকবে।

ইরাক ও ইরানের নদী-সীমান্ত নির্ধারণের বিষয়ে চুক্তিতে বলা হয় যে, শাতিল আরবে ইরাক ও ইরানের সীমানা থলওয়েগ লাইন অনুসারে একটি ইরাক-ইরান-আলজিরীয় যুক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে :

(১) ১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চের তেহরান প্রটোকল।

(২) শাতিল আরবে অবস্থানরত ইরাকী জাহাজ আলখাওরায় ১৯৭৫ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে নদী-সীমান্ত চিহ্নিতকরণ কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত রিপোর্ট অনুমোদনকারী ১৯৭৫ সালের ২০ শে এপ্রিল তারিখে বাগদাদে স্বাক্ষরিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি।

(৩) অকুস্থলে পরিদর্শিত ও ১৯৭৫ সালের সীমান্ত ও ভৌগলিক বিবরণ সঠিককৃত, পানি এলাকার বৈজ্ঞানিক বিবরণসম্বলিত সাধারণ মানচিত্র।

ক) ১নং মানচিত্র-শাতিল আরবের প্রবেশ পথ, নং ৩৮৪২। বৃটিশ এডমিরালটি কর্তৃক প্রকাশিত।

খ) ২ নং মানচিত্র—আভ্যন্তরীণ ভাগ চিহ্ন থেকে কাবদা পয়েন্ট, নং ৩৮৪৩। বৃটিশ এডমিরালটি কর্তৃক প্রকাশিত।

গ) ৩ নং মানচিত্র—কাবদা পয়েন্ট থেকে আবাদান, নং ৩৮৪৪। বৃটিশ এডমিরালটি কর্তৃক প্রকাশিত।

ঘ) আবাদান থেকে জজিরাতুল উম্মত তুরেলাহ, নং ৩৮৪৫। বৃটিশ এডমিরালটি কর্তৃক প্রকাশিত।

শাতিল আরবে থলওয়েগ লাইন

চুক্তিতে আরো বলা হয় যে, শাতিল আরবে সীমানা থাকবে থলওয়েগ লাইন অনুসারে অর্থাৎ, নৌ চলাচল এলাকার মধ্যসীমা অনুযায়ী। এটা ইরাক ও ইরানের স্থলসীমা যেখানে শাতিল আরবে যুক্ত হয়েছে, সেখান থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। পানির স্রোতের স্বাভাবিক কারণে এই সীমার স্থান পরিবর্তিত হবে, তবে উভয় পক্ষের বিশেষ চুক্তি ব্যতীত অন্য কোন কারণে এই সীমার স্থান পরিবর্তিত হবে না। এরূপ কোন পরিবর্তন সাধিত হলে তা উভয় পক্ষের সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক যুক্তভাবে স্বীকৃত হতে হবে। কিন্তু সীমান্ত এলাকা বরাবরই থলওয়েগ লাইন অনুসরণ করে চলবে। অবশ্য যদি নদীর তলদেশের পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহলে উভয় পক্ষের যৌথ খরচায় এই তলদেশ ঠিক রাখা হবে। তাছাড়া নয়া তলদেশে সীমা নির্ধারণের প্রশ্ন হলে যতক্ষণ না তা নির্ণীত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অর্থাৎ, থলওয়েগ লাইন অনুসারেই উভয় দেশের সীমান্ত চিহ্নিত থাকবে।

শাতিল আরবে উভয় দেশের সীমানা সম্পর্কে আলজিয়ার্স চুক্তিতে আরো বলা হয় যে, প্রতি ১০ বছর অন্তর উভয় দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি যুক্ত কমিশন সীমানার যথার্থতা সম্পর্কে নয়াভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে এবং কোনও পক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হলে এই সময়-সীমার পূর্বেও উভয় দেশের একটি যুক্ত কমিশন নয়াভাবে সার্ভে কাজ সম্পন্ন করবে। এ ধরনের সার্ভে কাজের ব্যয় উভয় পক্ষ সমানভাবে বহন করবে। তাছাড়া উভয় দেশের বাণিজ্যিক, রাষ্ট্রীয় ও যুদ্ধ জাহাজগুলি শাতিল আরবে চলাচলের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে কোন দেশের পানির সীমা মেনে চলার কোন প্রয়োজন হবে না। এমনকি উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি দেশ উহার পোতাশ্রয়ে আগমনের জন্য যে কোন বিদেশী যুদ্ধ জাহাজকে এককভাবে শাতিল আরবে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করতে পারবে। তবে অপর দেশের সাথে যুদ্ধরত অথবা অপর দেশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন দেশের, যুদ্ধ জাহাজকে এই

অনুমতি দেয়া যাবে না এবং এই অনুমতির ব্যাপারে অপর দেশকে সংশ্লিষ্ট জাহাজের শাতিল আরবে প্রবেশের অন্ততঃ ৭২ ঘণ্টা পূর্বে জানিয়ে দিতে হবে।

তাছাড়া চুক্তিতে আরও স্বীকার করা হয় যে, শাতিল আরব প্রাথমিকভাবে একটি আন্তর্জাতিক পানিপথ এবং উভয়পক্ষ এরূপ কোন কাজ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে যার ফলে শাতিল আরবে চলাচলের ব্যাপারে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

১৯৭৫ সালের ১০ই জুন তারিখে ইরাক ও ইরানের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তিতে বিস্তারিতভাবে আরও বহু বিষয় উল্লেখ করা হলেও এগুলিই হল চুক্তির মূল কথা। অতএব দেখা যায় যে, এরূপ একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর উভয় দেশের সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কিন্তু একে ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে যে, তথাপি শান্তি রক্ষিত হয় নাই।

ইরানীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা

যাহোক, কেবল ইরান সরকারের নিকটই নয়—ইরাকের পক্ষ থেকে আরব রাষ্ট্রসংঘ, জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার নিকটও ইরানের কার্যকলাপ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়।

নমুনাস্বরূপ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল আদম কোজোর নিকট ১৯৮০ সালের ১৬ই মে তারিখে ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদী কতৃক লিখিত পত্রের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা যায়। সাদুন হাম্মাদী কর্তৃক প্রেরিত পত্রটি ছিল নিম্নরূপ।

আফ্রিকান ঐক্য সংস্থায় সাদুন হাম্মাদীর পত্র

জনাব আদম কোজো, সেক্রেটারী জেনারেল, আরব ঐক্য সংস্থা,

আমি আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আপনার সংস্থার সদস্যগণকে ইরান সরকার ও তদীয় কর্মচারীদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও আচার-ব্যবহার

সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অবগত করাতে চাই যা প্রমাণ করবে যে, ইরান এখনো সিংহাসনচ্যুত শাহের বর্ণবাদী সম্প্রসারমূলক নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

সব ধরণের আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি ভঙ্গ করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শাহ যে তিনটি আরব দ্বীপ দখল করেছিল ইরান সরকার সেগুলি এখনো করায়ত্ত করে রেখেছে। তদুপরি এই দেশটি অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তথাকথিত ইরানী বিপ্লব অন্যান্য দেশে রফতানি করার হুমকি প্রদর্শন করছে।

প্রসঙ্গতঃ ১৯৮০ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে ইরানের প্রেসিডেন্ট আবুল হাসান বনি সদর কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির বিষয় আমরা উল্লেখ করব। "আন্‌নাহার আরব এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল" পত্রিকার নিকট প্রদত্ত এই বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বনি সদর বলেছেন যে, ইরান আরব দ্বীপ তিনটি কিছুতেই ছেড়ে দেবে না এবং ইরানের অভিমত অনুসারে আরব রাষ্ট্রগুলি যথা আবুধাবী, কাতার, দুবাই, কুয়েত এবং সউদী আরব কিছুতেই স্বাধীন দেশ নয়।

তদুপরি ১৯৮০ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে খোমেনি ও বনি-সদরের সাথে সাক্ষাতের পর ইরানী পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার ঘোষণা করেন যে, ইরাক হচ্ছে আসলে ইরানের অন্তর্ভুক্ত এলাকা এবং ১৯৮০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুতুবজাদেহ পরিষ্কারভাবে বলেন যে "এডেন এবং বাগদাদ আমাদের।"

আল-খোমেনিও বলেছেন, ইরাক যদি আরব দ্বীপগুলির ব্যাপারে অনড় মনোভাব প্রকাশ করে, তাহলে আমরা বাগদাদের উপর ইরানের সার্বভৌমত্ব দাবী করব। তাছাড়া খোমেনী ইরাকের জনগণ ও সেনাবাহিনীর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইরাক সরকারের পতন ঘটানোর আহবান জানিয়েছেন। ১৯৮০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ইরানের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুতুবজাদেহ ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সরকার ইরাক সরকারের পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ ছাড়াও ইরানী কর্তৃপক্ষ কিরমানশাহ্ এবং খোরাসান শহরস্থ ইরাকী কনস্যুলেট দু'টিতে এবং তেহেরানস্থ ইরাকী বিদ্যালয় ও ইরাকীদের উপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছে। ইরান সরকার ইরাকী কর্মচারীদের জীবননাশের জন্য অনেক সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালিয়েছে যার ফলে অনেকে নিহত ও আহত হয়েছেন, এদের মধ্যে অনেক মহিলা এবং শিশুও রয়েছে।

ইরানীদের এই নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি নীতি, জাতিসংঘ সনদ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি ও উদ্দেশের চরম পরিপন্থী, অথচ এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে ইরাক ছিল ইরানের প্রাথমিক সমর্থকদের অন্যতম।

ইরাকের প্রজাতন্ত্রী সরকার আশা করেছিল যে, ইরানের নয়া সরকার শাহের বর্ণবাদী সম্প্রসারণ নীতির লেশটুকু মুছে ফেলে ইরানী জনগণের সমস্যাগুলি সমাধানের কাজে মনোনিবেশ করবে। ইরাকী প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইরান সরকারের নিকট অনেকবার অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার এবং উত্তম প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু নিজেদের ব্যবহারের মাধ্যমে ইরান সরকার এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রেখেছেন যে, তারা শাহের অনুসৃত নীতি অনুসরণে, আরব রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বের বিঘ্ন সাধনে এবং এই এলাকায় বিরোধ ও উত্তেজনা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

প্রজাতন্ত্রী ইরাক স্বীয় সার্বভৌমত্ব, এলাকাগত অবিভাজ্যতা ও এর নিরাপত্তা রক্ষার সাথে সাথে আরব রাষ্ট্রবর্গের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কৃতসংকল্প অথচ ইরান সরকারের কার্যাবলী বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ।

আপনি এই পত্রের মর্মার্থ স্বীয় সংস্থার সদস্যদের অবগতার্থে প্রেরণ করলে আমি কৃতার্থ হব।

মহামান্য, আপনি আমার পরিপূর্ণ আন্তরিকতার আশ্বাস গ্রহণ করুন। ডঃ সাদুন হাম্মাদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ইরাক।

এটা ছিল ১৯৮০ সালের কথা এবং ইরানের মনোভাব সম্পর্কে ইরাকের এই বিশ্লেষণ যে নিছক কল্পনাপ্রসূত ছিল না, তা সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী থেকেই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া ইরানী নেতৃবৃন্দের এই মনোভাব সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে যা—ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাংস্কৃতিক একটি বাণীতেও প্রতিফলিত হয়েছে।

চতুর্থ কোর কম্যাণ্ডের নিকট সাদ্দাম হোসেনের বাণী

চতুর্থ কোর কম্যাণ্ডারের নিকট গত ৩০ শে মার্চ ১৯৮২ তারিখে প্রেরীত এক বাণীতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন, ইরাক ও ইরানী জাতির মধ্যে কোন সীমানার অস্তিত্ব নাই বলে খোমেনী যে কথা বলেছেন তা প্রকৃতপক্ষে ইরান কর্তৃক ইরাককে স্বীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। আপনি জানেন, ইরাকের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ব্যতিত আমাদের গত্যন্তর ছিল না, তারা আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আমাদেরকে জোরপূর্বক বাধ্য করেছে। তারা ১৯৮০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করেছে। শত্রুরা আমাদের মুক্ত ইচ্ছায় নির্ণীত জীবনধারা বিনষ্ট করার জন্য আমাদের নিরাপদ শহরগুলিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে, তারা চেয়েছে যেন তেহরানের নিকট আমরা নতজানু হই।

"যুদ্ধ যখন ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায় এবং আমাদের সেনাবাহিনী যখন সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখনও আমরা আমাদের জাতীয় ও মানবিক কর্তব্য বিস্মৃত হইনি এবং আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কিন্তু শত্রুরা এই উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। অতএব যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

ইরানী সৈন্যরা অন্যান্য এলাকার মত, আপনার সেক্টরে ইরাকী সীমান্তের অনেক দূরে অবস্থান করলেও খামেনী ঘোষণা করেছেন যে, ইরানী সৈন্যরা ইরাক সীমান্তের কাছাকাছি আসার পর ইরাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। কারণ, ইরাকের কোন এলাকা দখল করার ইচ্ছা তাদের নাই।

কিন্তু খোমেনী ভুলে গেছেন এবং জনমতকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন যে তারা জেইন আল কওস এবং সইফ সাদ দখল করে এই এলাকাগুলিকে ১৯৮০ সালের পূর্বেই আমাদের শহরগুলিকে আক্রমণ চালানোর ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করেছে। হয়তবা এটাও খামেনীর মনে নেই যে ১৯৮০ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বরের পূর্বেই তাদের সাঁজোয়া বাহিনী আমাদের জনাকীর্ণ বসরা শহরে আক্রমণ চালিয়েছে এবং নারী ও শিশু নির্বিশেষে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে।

খামেনী ভেড়ার চামড়া পরিধান করতে চেয়েছে কিন্তু তার "ইরাক ও ইরানী জাতির মধ্যে সীমান্তের কোন অস্তিত্ব নাই" কথার মধ্যে আসল চেহারা ফুটে উঠেছে। এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 'সীমান্ত নাই' কথার মাধ্যমে খামেনী ইরাক দখল করার সুযোগ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। ইরাকের কোন অংশ দখল করেই তারা সন্তুষ্ট হতে চায় না, ইরাক ও ইরাকী জনগণকে পদানত রাখাই খামেনীর উদ্দেশ্য।"

যুদ্ধ শুরুর কাহিনী

লক্ষ্যযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ১৯৮২ সালের ৩০ শে মার্চ তারিখে, "তারা ১৯৮০ সালের ৪ঠা সেপটেম্বরের পূর্বেই আমাদের আক্রমণ করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৮০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পূর্বেকার অবস্থা কিরূপ ছিল?

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৮০ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকেই ইরাক-ইরান সীমান্ত এলাকায় ইরানী

সৈন্যদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ২৮শে জুলাই তারিখে ইরানের সাঁজোয়া বহর ইরাকের আলসিব সীমান্ত-চৌকি আক্রমণ করে বিধ্বস্তকরে দেয় এবং এই ধরনের ঘটনাবলীই পরবর্তীকালে প্রকৃত যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। তেহরানের পক্ষ থেকে এই সময়ে সদম্ভে এ ঘোষণাও করা হয়েছিল যে, "ইরানী বাহিনী যখন বাগদাদের দিকে যাত্রা শুরু করবে, তখন এই বাহিনীকে আটকে রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। শুধুমাত্র একটি ঘোষণাপত্র জারী করেই আমরা বাগদাদ সরকারের পতন ঘোষণা করতে সক্ষম হবো।"

ইরানের আক্রমণ ও স্বীকৃতি

আগষ্ট মাসে এই পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি আরো সঙ্গীন হয়ে উঠে। ৬ই আগষ্ট তারিখে ইরান সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে এই মর্মে যোগাযোগ স্থাপন করে যে, সোভিয়ট ইউনিয়ন ইরাকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিলে ইরান তাদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করবে। তাছাড়া ২৭শে আগষ্ট তারিখে ইরানের পক্ষ থেকেই ঘোষণা করা হয় যে, কাসর-এ-শিরীন সেক্টরে তুমুল যুদ্ধ চলছে এবং তা সংশ্লিষ্ট সীমান্তেরসব এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। লা-মণ্ডে পত্রিকার ২৯ শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই যুদ্ধে ইরানী বাহিনী প্রথম ভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে।

৪ঠা সেপ্টেম্বরের যুদ্ধ

এভাবে ইরানী বাহিনী কর্তৃক ইরাকের খানেকীন, মুজায়রিয়াহ্, জুরবতিয়াহ্, কাতা-মান্দালী ও মোস্তফা ল'ওয়ালড নামক গ্রামগুলি এবং নাফতী খানেহ তেল কারখানার উপর বোমা বর্ষণ করার পর ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে তুমুল নৌ ও আকাশ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উভয় পক্ষের সামরিক ইশতেহার অনুসারে এই এলাকাগুলিতে উভয় দেশের আহত ও নিহতদের সংখ্যা ছিল অনেক। বৃহস্পতিবারের যুদ্ধে ইরাক

ইরানের দু'টি ফ্যানটম বিমান ভূপাতিত করে বলেও দাবী করে। বস্তুতঃ ইরান এই সময় থেকেই প্রকৃত যুদ্ধ শুরু করে এবং ইরাকের যুদ্ধ শুরু হয় কাসর-এ-শিরীন ও মেহেরান নামক গ্রাম দুটিতে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে।

যুদ্ধের তীব্রতা লক্ষ্য করে ইরাক সরকার কিছুটা বিস্মিত হয়ে যায় এবং তারা অযথা ক্ষয়-ক্ষতির পথ পরিহার করে কূটনৈতিক পদ্ধতিতে বিরোধ মীমাংসার পথে অগ্রসর হয়। ইরাকের পক্ষ থেকে বাগদাদস্থ ইরানী রাষ্ট্রদূতের নিকট ইরানী বাহিনী ইরাকী এলাকার যে ক্ষতি সাধন করেছে, তার বিবরণসম্বলিত একটি পত্র অর্পণ করা হয়। কিন্তু এই শুভেচ্ছা ইরানী কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে পারে নাই। ইরানী বিমান-বহর একের পর এক আল-হোসেন, কোতাইবা, হোউক ও গাজালীর সামরিক চৌকিগুলি এবং খানেকীন গ্রামের উপর আক্রমণ করে চলে।

বস্তুতঃ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশদভাবে অবগত হওয়ার জন্য আরও পূর্বেকার ঘটনাবলী আলোচনা করা প্রয়োজন এবং এজন্য ১৯৮০ সালের ১লা এপ্রিল, মঙ্গলবারের ঘটনা থেকে বিশ্লেষণ শুরু করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা

এই দিনে আরব ও এশিয়ার অন্যান্য কতিপয় দেশ থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র বাগদাদের আল-মুস্তানসিরিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৬৩ সালের বিপ্লবের পরে আব্বাসীয় খলীফা আল-মুস্তানসিরের নামানুসারে বাথ পার্টি কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ছাত্র সমাবেশ তখন ইরাকের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ও বিপ্লবী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের সদস্য তারিক আজিজের আগমনের অপেক্ষা করছিল। কথা ছিল, তারিক আজিজ ইরাকের ছাত্রদের জাতীয় ইউনিয়ন ও এশিয়াটিক ষ্টুডেন্ট কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কনফারেন্সের উদ্বোধন করবেন। এই ছাত্র জমায়েতে

তখন এমন একটি ইরানী যুবকও ছিল যাকে আবর্তন করেই এই ঘটনা এগিয়ে যাবে।

তারিক আজিজ উপস্থিত হওয়া মাত্র তুমুল হর্ষধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণের মাধ্যমে তাকে অভিনন্দিত করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই ইরানী যুবকটি তারিক আজিজকে লক্ষ্য করে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। বিপদ দেখে জাতীয় ইউনিয়নের ছাত্রনেতা মোহাম্মদ দাবদাব "দেখুন বোমা মারা হয়েছে!" বলে চিৎকার করে নিজে তারিক আজিজের সামনে এসে দাঁড়ান। তারিক আজিজ তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করেন, তবে আহত হন। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণের ফলে বহুসংখ্যক ছাত্র নিহত ও আহত হয়। ছাত্রনেতাদের সাথে আলোচনা করে তারিক আজিজ অবশ্য কনফারেন্স শুরু করেছিলেন, কিন্তু আহত হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের লিখিত ভাষণ পাঠ করতে পারেন নাই। পরে অবশ্য ঘটনাস্থলে আরো একটি বোমা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বোমাটি বিস্ফোরিত হয় নাই। এই বোমাটি নিক্ষিপ্ত হলে কত যে ছাত্র মারা যেত কে জানে।

বাগদাদে যখন এই ঘটনা ঘটেছিল ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তখন সীমান্ত এলাকা সফর করছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রায়ই দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন এবং গ্রামবাসীদের খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। তিনি সেদিন এমনি এক সফরে ছিলেন। তাঁর অভ্যর্থনায় আগত লোকদের তখন তিনি বলছিলেন, "ইরাকী জনগণ কোন দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না, যদি না প্রমাণিত হয় যে, প্রতিপক্ষের আকাঙ্ক্ষা তদ্রূপ এবং তারা ইরাকের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় মর্যাদা বিনষ্ট করতে আগ্রহী। যদি কেউ ইরাকের ও আরবের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট করতে চায়, তাহলে আমরা তাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, ইরাক এই ধরনের প্রতিবন্ধকতার সমুচিত জবাব দিবে। আমরা আমাদের নীতি এবং কর্তব্যের বিষয়ে কোনরূপ আপোষ করব না।

আল-মুসতানসিরিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত কনফারেন্সে অবশ্য এরপর আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। তারিক আজিজের লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনান হয়েছিল এবং কনফারেন্সটি সাফল্যজনকভাবেই শেষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনার খবর বেতারে প্রচার করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সেদিন বিকালেই বাগদাদ পৌঁছে আহতদের দেখার জন্য সরাসরি হাসপাতালে গমন করেন।

পরের দিন অর্থাৎ, ২রা এপ্রিল তারিখে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। তাঁর মুখমণ্ডলে তখন বিষাদের ছায়া ঘনীভূত ছিল ঘটনাস্থলে অনেক ছাত্রের উপস্থিতিতে প্রদত্ত ভাষণের প্রথমেই তিনি ইরাক ও প্রতিবেশী আরব দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য ইরানকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করে দেন। তিনি বলেন, "গতকাল একটি ঘৃণ্য এজেন্ট মুসতানসিরিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রক্তপাত ঘটিয়েছে।" প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন অতঃপর এই জঘন্য কার্যকলাপের সমুচিত প্রতিবিধান করা হবে বলে তিন বার শপথ গ্রহণ করেন।

পরবর্তী তদন্তের ফলে বোমা নিক্ষেপকারী ছাত্রটি দাওয়াত আল-ইসলাম' সংস্থার সদস্য বলে জানা যায়। ইরানের কোম শহরে এই সংস্থাটির সদর দফতর অবস্থিত। সংস্থার সদস্যরা খোমেনীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। ১৯৫৮ সালের দিকে ইরাকে এই সংস্থার শাখা গড়ে তোলা হয়েছিল। তখন ইরানের শাহ এই সংস্থাটিকে প্রতিবেশী দেশগুলিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করত। শাহের পতনের পূর্বেই ইরাকী কর্তৃপক্ষ ইরাকের অভ্যন্তরে এই সংস্থার নাশকতামূলক কার্যকলাপের অনেক প্রমাণ পেয়েছিলেন। ইরানী বিপ্লবের পর কর্তৃপক্ষ এই সংস্থাটিকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা বর্ষণ ঘটনার পরবর্তী সময়েও ইরানী কর্তৃপক্ষের সাথে এই সংস্থার নাশকতা-মূলক বিষয়ে যোগসাজশের অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৫ই এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় নিহতদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রায় ইরানীদের একটি বিদ্যালয়ের জানালা থেকে অপর একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ইরাকে বসবাসরত ইরানীদের সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং বিশেষ-ভাবে যারা অনুমোদন ব্যতিরেকে ইরাকে বসবাস করছে, তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া শুরু হয়। এই তদন্তের ফলে বেশ কয়েকটি গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে প্রচুর টাকা-পয়সা ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ইরানী প্রচারপত্র ধরা পরে। এর ফলে যারা এই নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য দায়ী তাদের ইরাক থেকে বের করে দেয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দোষী ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিল দোকানদার অথবা ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক।

এরপর ঘটল ১২ই এপ্রিল তারিখের ঘটনা। এবার ইরাকের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী লতীফ সাইফ জসীমকে হত্যার চেষ্টা চালান হয়। আক্রমণকারী শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে এবং আল-দাওয়াত পার্টির সাথে নিজের যোগসাজশের কথা স্বীকার করে।

এই ঘটনাবলী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৮০ সালের ১লা এপ্রিলের আগে থেকেই ইরাক ও ইরানের সম্পর্কের অবনতি ঘটছিল। বিষয়টির সত্যতা ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবুল হাসান বনি সদরের উক্তি থেকেও প্রমাণিত হয়। বনি সদর সেপ্টেম্বর মাসে বলেছিলেন যে, "ইরানে ইসলামিক রিপাবলিক গঠিত হওয়ার সময়ই উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজিত ছিল।"

১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে আম্মানে অনুষ্ঠিত আরব পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের সম্মেলনে ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সাদুন হাম্মাদী যে ঘোষণা-পত্রটি বিলি করেছিলেন, তাতে এই বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। ঘোষণাপত্রটিতে বলা হয়ঃ আরব জাতিগুলি, বিশেষ করে,

ইরাক একই ভৌগোলিক সীমারেখায় ইরানের সাথে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে ধর্মীয় যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও খোমেনীর ইরানে প্রত্যাবর্তনের সময় থেকে ইরানে এক ধরনের গোঁড়ামী পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং ইরান শাহের আমলের সে নীতিই অনুসরণ করছে যা আরব ও ইরাকের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ।

তাছাড়া খোমেনীর তেহেরান প্রত্যাবর্তনের সময় থেকে বাগদাদ ও তেহেরানের মধ্যে সম্পর্কের যে দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে, তা থেকেও বিষয়টির সত্যতা সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণিত হয়।

খোমেনী ও তাঁর সঙ্গীদের কার্যকলাপ

প্রসঙ্গতঃ খোমেনীর কার্যকলাপের উপরও কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন, যা ইরাক ও ইরানের মধ্যকার বর্তমান বিরোধের সূত্রপাত সম্পর্কে আলোকপাত করবে। ১৯৬৩ সালের আগে খোমেনী নিজের দেশেই অপরিচিত ছিলেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানী জনগণের পশ্চাৎপদতাকে দূর করার উদ্দেশে শাহ শ্বেত-বিপ্লব নামে এক সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু করে তা সমর্থন করার জন্য ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে ইরানী পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। পার্লামেন্ট শাহের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু এই উদ্যোগে যুগ যুগ ধরে মোল্লারা যেসব সুবিধাবলী ভোগ করছিল তা ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে ইমাম খোমেনী পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত সংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধীতা শুরু করেন।

খোমেনীর ইরাকে আশ্রয় গ্রহণ

শাহ খোমেনীর বিরোধিতার ফলে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে খোমেনীকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিলে তিনি ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে দেশ ছেড়ে ইরাকে গিয়ে উপস্থিত হন। ইরাকী কর্তৃপক্ষ খোমেনীকে তাড়িয়ে না দিয়ে তাকে আশ্রয় দেন এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করেন। তবে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে খোমেনীর

রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং খোমেনীও এই বিধি-নিষেধ মেনে চলতে প্রতিশ্রুত হন।

কিন্তু খোমেনী সম্পর্কে বাগদাদের এই মনোভাব শাহ সহজভাবে গ্রহণ করেন নাই। কয়েকবারই তিনি খোমেনীকে ইরান সরকারের হাতে অর্পণ করার জন্য ইরাকী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান এবং এমনকি খোমেনীকে হস্তান্তর না করা পর্যন্ত তার ইরাক সফর স্থগিত থাকবে বলেও জানিয়ে দেন। কিন্তু ইরাকী কর্তৃপক্ষ শাহের এই চাপের মুখে কোনদিনই নতি স্বীকার করেন নাই।

১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে কোম ও তাব্রীজ শহরে ইরানী নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এই বিক্ষোভকারীদের মূল দাবী ছিল শাহের পতন ঘটিয়ে ইরানে জনগণের শাসন কায়েম করা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইরাকে এই আন্দোলন ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে। শাহের মার্কিন ঘেঁষা নীতির ফলে ইরাকী বাথ পার্টির নেতৃবৃন্দও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ইরাকের প্রতি খোমেনীর বিরূপ মনোভাব

১৯৭৮ সালের শেষাবধি ইরানের ঘটনাবলীতে খোমেনীর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং খোমেনীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর প্রদত্ত সকল ওয়াদা ভঙ্গ করে যা ইরাক-ইরান সম্পর্কের অবনতি ঘটার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাগদাদ কর্তৃপক্ষের নিকট এ সময় নিবৃত্ত হওয়া অথবা ইরাক ত্যাগ করা—এ দু'টির কোন একটি বেছে নেবার জন্য খোমেনীকে অনুরোধ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। খোমেনী তখন স্বেচ্ছায় ইরাক ত্যাগ করে প্যারিসের উপকণ্ঠে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইরানে বিক্ষোভকারীদের পরিস্থিতি তখন এই অবস্থা অনুধাবন করার পক্ষে অনুকূল ছিল না। খোমেনীকে ইরাক ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে এতটুকুই তাদেরকে ক্রোধান্বিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তদুপরি বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এসময় একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ইরাকী বাথ পার্টির কর্মকর্তারা খোমেনীকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রেখেছেন। এই গুজব বিশ্বাস করেই তেহরানস্থ ইরাকী দূতাবাস ও খোরাসান শহরস্থ ইরাকী কনস্যুলেটের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়ে যায়।

অতএব এটা লক্ষ্যযোগ্য যে, কেবলমাত্র একটি গুজবের ভিত্তিতে ইরাক ও ইরানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে এবং এসব কথা জেনেও খোমেনী পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার কোন চেষ্টা করেন নাই, বরং ইরানে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি ইরাক কর্তৃক প্রদত্ত সব সাহায্য-সহযোগিতার কথাও বেমালুম ভুলে যান। যার ফলে এই সময় থেকে উভয় দেশের সম্পর্কের আরো দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে খোমেনী ইরানে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় উভয় দেশের তিক্ততা নিরসনের জন্য বাগদাদের পক্ষ থেকে কয়েকবার প্রচেষ্টা চালান হয়, কিন্তু তেহরানের পক্ষ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। তদুপরি ১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে ইরানী রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইরাকের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আহমদ হাসান আল বকর যে বাণী পাঠিয়েছেন তদুত্তরে যথাযোগ্য শালীনতা রক্ষিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা যায় না এবং এটাও স্মরণযোগ্য যে, উভয় দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ইরাকী কর্তৃপক্ষ ইরানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মেহদী বাজারগানকে বাগদাদ সফরের জন্য যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তার জবাব পর্যন্ত দেয়া হয় নাই। খোমেনী ও তার সঙ্গী-সাথীদের এই মনোভাব ইরানী বিক্ষোভকারীদের আরো উৎসাহিত করে তোলে এবং একদিন তারা তেহরানের মোসাদ্দেক এভিনিউস্থ ইরাকী দূতাবাস আক্রমণ করে বসে। দিনের পর দিন এবং দলের পর দল তারা দূতাবাসে আসতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের ইরাক বিরোধী শ্লোগান দিয়ে দূতাবাস তছনছ করার কাজ চালিয়ে যায়। তারা দূতাবাসের দরজা-জানালা ভেঙ্গে ফেলে, দূতাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কর্মচারীদের মারধর করে। এমনকি ইসলামিক রিপাবলিক পার্টির মুখপাত্র "জমহুরী ইসলামী" পত্রিকায় রাষ্ট্রদূতকে পর্যন্ত গুপ্তচর বলে আখ্যায়িত করে।

ইরাকের পক্ষ থেকে এসব কার্যাবলীর প্রতিবাদ জানানোর সাথে সাথে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ইরানী কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার অনুরোধ জানানো সত্বেও এ বিষয়ে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই, বরং ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে অর্থাৎ, ১১ই ও

২৬শে অক্টোবর এবং ১লা ও ৭ই নভেম্বর তারিখে খোরাসান শহরস্থ ইরাকী কনস্যুলেটে পর পর চার দিন আক্রমণ চালানো হয়।

যাহোক, এসব ঘটনা চলাকালেই ইরানী বিক্ষোভকারীরা সেদেশের আরবী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানরত ইরাকী শিক্ষকদের হয়রানি করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত ইরান সরকার এই বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষকদের গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে ইরাকেও একই ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং ইরাকস্থ ইরানীদের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায়।

ইরাক ও ইরানের মধ্যকার সম্পর্কের এই তিক্ততা কেবল এসব বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ইরানের পক্ষ থেকে ইরাকী জনগণকে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উস্কানীও দেয়া হয়। পরিষ্কার-ভাবে একথাও বলা হয় যে, ১৯৭৯ সালে শাহ কর্তৃক দখলীকৃত এলাকা ফিরিয়ে দেয়া হবে না এবং প্রয়োজনবোধে বাহরাইন দখল করে নেয়া হবে। তাছাড়া আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কেও ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হয়।

১৯৭৯ সালের কথা। তখন বনিসদর ছিলেন ইরানের অর্থমন্ত্রী। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে লেবাননের "আন-নাহার" সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "আরব জাতীয়তাবাদ ইহুদীবাদেরই সমতুল্য। আরব জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। একই পত্রিকার প্রতিনিধিকে ১৯৮০ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে তিনি বলেন, "ইরানের দৃষ্টিতে আবুধাবী, কাতার, ওমান, দুবাই, কুয়েত ও সউদী আরবের মত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বলতে কিছুই নাই।" কেবল বনিসদরই নন, ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদেক কুতুবজাদেহ্‌ও একই সুরে সুর মিলিয়েছেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে উপসাগরীয় এলাকা সফরকালে তিনি আরব জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ইরানী বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করার জন্য আরব নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন জানিয়ে-ছিলেন। কিন্তু আরব নেতৃবৃন্দ তখন তাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে

দিয়েছিলেন যে, আরব জাতীয়তাবাদ ইসলাম বিরোধী কোন কিছু নয়, বরং এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামসম্মত ব্যবস্থা।

আরব জাতীয়তাবাদকে ইরান প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিরোধী মনোভাব বলে মনে করে থাকে। এটা অবশ্য ইসলাম সম্পর্কে ইরানী কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যাখ্যা। ইরানের এ জাতীয় মতবাদ কেবল ইরান ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই নয়, বরং মাঝে মধ্যে সারা মুসলিম জাহানে আলোড়ন তুলেছে।

প্রসঙ্গতঃ ১৫ই শাবান ১৩৯৯ হিজরী উপলক্ষে প্রদত্ত খোমেনীর ভাষণের বিষয় উল্লেখ করা যায়। ১৫ই শাবান সম্পর্কে খোমেনী বলেন ঃ

"শাবান মাসটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। কারণ, এ মাসের তৃতীয় দিনে মানবকুলের মোজাহিদ ইমাম আল হোসাইন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এ মাসের ১৫ তারিখেই বিশ্ব যার জন্য অপেক্ষারত সে মেহদী (তার জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হোক—) জন্মগ্রহণ করেন। সাহেবের (মেহদী) অনুপস্থিতির বিষয়টির তাৎপর্য অনেক এবং এ বিষয়টি আমাদের অনেক কিছু শিক্ষাদান করে। কারণ, ন্যায়কে প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত করার মহান মিশনকে সফল করার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রয়োগের উদ্দেশে পয়গম্বরদের প্রেরণ করার সময় মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র আল-মেহদীকে (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ব্যতীত অপর কাউকে সুরক্ষিত রাখেন নাই।

"তাদের লক্ষ্য ছিল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। মহান ও পবিত্র মেহদী এসেছিলেন মানব-জাতির পুনর্জাগরণের জন্য, সারা বিশ্বে ন্যায় ও নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সাধারণভাবে ন্যায় বলতে যা বোঝা যায় অর্থাৎ, পৃথিবীর বুকে মানুষের কল্যাণের জন্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা মাত্রই তা নয়, এই ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা হল জীবনের সর্বস্তরের পার্থিব,

আধ্যাত্মিক, মানসিক, সচেতন অথবা অবচেতন পর্যায়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

"প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত বিশ্বাসকে ত্রুটিমুক্ত করাই হ'ল মানব-জাতির জন্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আল্লাহর হেফাজতকৃত মেহদী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ব্যতীত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কেউই, এমনকি একই উদ্দেশ্যে আগত পয়গম্বরগণও এই যোগ্যতার অধিকারী নন। পয়গম্বরগণ যা করার ইচ্ছা করেছিলেন অথচ নানাবিধ বিপত্তির জন্য করতে পারেন নাই, ন্যায়ের সেই প্রকৃত-ভাবকে রূপদান করার জন্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ আল-মেহদীকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।"

"এজন্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ মেহদীর জীবন দীর্ঘায়িত করেছেন। এটা বুঝানোর জন্য যে, কেবলমাত্র তিনি ব্যতীত মানুষের মধ্যে এবিষয়ে সাফল্য লাভ করার মত অপর কেউ নাই। মোটকথা এই যে, আল মেহদী যদি মৃত্যুবরণ করে থাকেন তাহলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য আর কেউ নাই এবং এই উদ্দেশ্যে কাউকেও সুরক্ষিত রাখা হয় নাই। অতএব সাহেবের (তাঁর জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হোক-) জন্ম অনুষ্ঠানটির চেয়ে মুসলমানদের নিকট মহান ও মানবজাতির জন্য বড় অপর কিছুই হতে পারে না।

"নবী মুহাম্মদের জন্মকে যদি মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয়, তাহলে একথা রয়ে যায় যে, যা চেয়েছিলেন তা তিনি অর্জন করতে পারেন নাই। এবং মহান সাহেব আল-মেহদী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সারা বিশ্বে ন্যায়কে সম্প্রসারিত করবেন এবং ন্যায়ের সব পর্যায় প্রতিষ্ঠিত করবেন।..."

১৫ই শাবান উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে খোমেনী আরও বলেন যে, "আমাদের উচিত চলতি দিনগুলোতে আল-মেহদীর (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক-) আগমন প্রতীক্ষায় নিজেদের প্রস্তুত করে নেয়া।

আমি তাঁকে নেতা হিসাবে অভিহিত করতে পারছিনা। কারণ তিনি হলেন সবচেয়ে বড়, আমি তাঁকে পয়গম্বরও বলতে পারছি না, কারণ তাঁর দ্বিতীয়ও কেউ নাই। আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, প্রত্যাশিত মেহদী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক-) হলেন এরূপ একজন যাকে আল্লাহ মানবজাতির জন্য হেফাজত করেছেন। আমাদের উচিত, তাঁর সাথে দেখা করার জন্য সর্বদা নিজেদের প্রস্তুত রাখা। যদি আমরা তাঁর সাক্ষাৎলাভে ধন্য হতে পারি; তাহলে আমাদের চেহারা নিষ্পাপ ও উজ্জল হয়ে উঠবে।

"আমাদের দেশে কার্যরত সব সংবাদমাধ্যমগুলির উচিত এই বিষয়টির প্রতি নজর রাখা এবং মহিমান্বিত মেহদীর (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক-) সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশে নিজেদের প্রস্তুত রাখা। টেলিভিশন এবং রেডিওর ব্যাপারে আমি সব সময় বলে আসছি যে, এগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। অন্যান্যরা বলে যে, এজন্য দ্বিতীয় চ্যানেল রয়েছে, কিন্তু আমরা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চাই।

আমাদের সময়ে ইরান সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। দুষ্ট হাতগুলি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। যেসব মাধ্যমগুলি এর আগে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী সরকারের পক্ষে কাজ করেছে, তাদের উচিত এখন দ্বিতীয় চ্যানেলে কাজ করা যেন তারা নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারে। তাদের বুঝা উচিত যে, গত ৫০ বছর ধরে আমাদের যুবসমাজ মন্দ শিক্ষা লাভ করেছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও একই পরিস্থিতি বিরাজিত ছিল এবং টেলিভিশন-রেডিও ও সংবাদপত্রগুলি সবসময় দুর্নীতি প্রচার করত। এর ফলে সর্বস্তরের জনগণ এমনকি মরুভূমির লোকগুলিও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলি এখন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের অতীত অপরাধ মোচন করতে পারে।"

"সিনেমাকেও গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে। আমি জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, ইরান শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। রেনেসাঁর সাফল্যের জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেককে এর জন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে কোন্দল পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, রেডিও এবং টেলিভিশন যেন কখনো এরূপ কিছু প্রচার না করে যা জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

"আমাদের হুশিয়ার থাকতে হবে যে, আমাদের অনেক শত্রু রয়েছে, যারা আমাদের জন্য নানা ধরনের সংকট সৃষ্টি করতে চায়। এ ধরনের সংকট দূর করার জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। বিভ্রান্তদের আমাদের সঠিক পথ দেখাতে হবে। আর যদি তারা সৎ পথে না আসে, তাহলে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এ ধরনের লোকদের সাথে আমরা যখন কঠোর ব্যবহার করি, তখন মনে হয়, যেন তারা অত্যাচারিত হচ্ছে। এই অবস্থা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। অতএব এবিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।

"আমি আশা করি, ভ্রান্ত লোকগুলি যখন আবার পথে ফিরে আসবে, তখন আমরা সবাই তাদের আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করব। আমি আরও আশা করি যে, জনগণ ১৫ই শাবানের এই অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে পালন করবে এবং ইমাম মেহদীর (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক-) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করবে।

"রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমগুলির সবচেয়ে বড় কাজ হল আমাদের শত্রু ও তাদের কার্যকলাপ চিহ্নিত করে জনগণকে এ ব্যাপারে হুশিয়ার করে দেয়া এবং দেশে শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করা। আমাদের এরূপ কাজ করা উচিত নয়, যাতে শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ লাভ

করে। আল্লাহ যেন আমাদের ইসলাম ও দেশের জন্য কাজ করার তওফীক দান করেন।

১৫ই শাবান উপলক্ষে প্রদত্ত ইমাম খোমেনীর এই ভাষণ, বিশেষ করে হযরত ইমাম মেহদী (আঃ) প্রসঙ্গে আফজালুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মোজতবা (সঃ) সম্পর্কে তাঁর কিয়ৎপরিমাণের অনুযোগসুচক মনোভাব সারা মুসলিম জাহানে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় সৃষ্টি করে। কেবল মুসলিম বিশ্বের ওলামাগণই নহেন, বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকাগুলিতেও "প্রতীক্ষিত মেহদী (আঃ) সংক্রান্ত খোমেনীর মতবাদ তওহীদ বিরোধী" বলে মন্তব্য করা হয়।

যাহোক, খোমেনীর ইরান প্রত্যাবর্তনের পর ইরাক-ইরান সম্পর্কের দ্রুত অবনতির বিষয়টি আমরা আলোচনা করছিলাম। এই সম্পর্কে মূলতঃ খোমেনী কর্তৃক ইরানী বিপ্লব রফতানী করার আহ্বানের পর থেকে সমস্যা জটিলতর হতে শুরু করে। বিপ্লব রফতানী করার মতামত বস্তুতঃ খোমেনীর নিজের খসড়াকৃত একটি ভাষণে প্রথম ব্যক্ত করা হয়। এই খসড়াটি খোমেনী রচনা করেছিলেন ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে। খোমেনীর পক্ষ থেকে তদীয় পুত্র কর্তৃক পঠিত এই ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "আমাদের বিপ্লব বিশ্বের অন্যান্য দেশে রফতানী করার জন্য আমরা সম্ভাব্য সব কিছুই করছি।"

এই ঘটনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা বর্ষণের ঘটনা এবং অন্যান্য ইরানী নেতৃবৃন্দের ব্যক্ত মতামত, বিশেষ করে, আন-নাহার পত্রিকায় প্রকাশিত বনিসদরের অভিমতের ফলে বাগদাদের পক্ষ থেকে দু'টি প্রতিবাদ-লিপি প্রেরিত হয়। এটা হ'ল ১৯৮০ সালের ২রা এপ্রিল তারিখের কথা। প্রতিবাদলিপি দু'টি পাঠিয়েছিলেন ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদী। এর একটি দেয়া হয়েছিল জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির ৬ষ্ঠ সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাষ্ট্রোর নিকট এবং অপরটি পাঠানো হয়েছিল জাতিসংঘের তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল কুট ওয়ার্ল ড-

হেইমের সমীপে। ১৯৮০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর একটি জবাব দেন যাতে স্পষ্টতঃই তিনি উল্লেখ করেন যে, এডেন ও বাগদাদ ইরানী কর্তৃত্বভুক্ত এলাকা। একই দিনে খোমেনীও একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, ইরাক যদি দ্বীপ তিনটি থেকে আমাদের চলে আসার বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করে, তাহলে বাগদাদের উপর আমরা কর্তৃত্ব দাবী করব। খোমেনী ইরাকী জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যেও রাষ্ট্রদ্রোহিতার আহ্বান জানান এবং ৯ই এপ্রিল তারিখে কুতুবজাদেহ ঘোষণা করেন যে, ইরাক বিজয়ের জন্যই ইরান সরকার প্রতিষ্ঠিত।

ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদীর জবাবে প্রদত্ত ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্তির পর ১৯শে এপ্রিল তারিখে ইরানী সংবাদপত্র "জমহুরী ইসলামী" খোমেনীর একটি আবেদন প্রকাশ করে। এই আবেদনে আল খোমেনী বলেন: নির্যাতনকারীদের নিকট নতি স্বীকার করে থাকা ইরাকী জনগণের উচিত নয়, ইরাকী সেনাবাহিনীর উচিত অনৈসলামিক দল বাথ পার্টিকে উৎখাত করা।

এই বক্তব্যে খোমেনী কবল উভয় দেশের সম্পর্কের প্রশ্নেই নয় বরং বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক রীতিনীতিরও খেলাফ করেছেন। তাছাড়া ইরানী বিপ্লবের এই পর্যায়ে খোমেনী স্বীয় জাতির নিকট যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন তাতে তাঁর এধরনের মন্তব্যের পর উভয় দেশের সম্পর্ক চরম পর্যায়ে না পেঁাছার বিষয়টিই বরং বিস্ময়ের কথা।

যা হোক, ২৩শে এপ্রিল তারিখে কুতুবজাদেহও অনুরূপ একটি মন্তব্য করেন। এদিনের বেতার ভাষণে কুতুবজাদেহ বলেন, "ইরাকী জনগণ একটি মারাত্মক অপরাধী সরকারের অধীনে রয়েছে, তাদের সাহায্য করা ইরানী জনগণের একটি দায়িত্ব।" তাছাড়া একই দিনে মোল্লা মোহাম্মদ শিরাজী যে কথাগুলি বলেছিলেন, তাও প্রসঙ্গতঃ

বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। মোল্লা শিরাজী ইরাকের বাথ পার্টিকে একটি ডাকাত দল বলে আখ্যায়িত করে এই দলের পতন ঘটানোর কাজে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য ইরানী জনগণের কাছে আবেদন জানান এবং বলেন যে, ইরানের প্রতিটি মানুষকে বাথ পার্টির বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত হতে হবে এবং এই দলের পতন ঘটানোর জন্য তাদের সাথে সব প্রকার অসহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।

ইরানী নেতৃবৃন্দের এই ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা-ভাষণ স্বাভাবিকভাবেই ইরাক ও ইরানের সম্পর্ককে ক্রমশঃ চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠে তাতে স্বাভাবিকভাবেই সীমান্তের উভয় দিকে অন্ততঃ নাশকতামূলক কার্যকলাপ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। ইতিহাসের ধারা-প্রবাহ অন্ততঃ এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, দেশ ও জাতিগত প্রশ্নে মানুষের আবেগ যখন অনুরণিত হয়ে উঠে তখন হিতাহিত জ্ঞান তাকে বঞ্চিত করে। এমতাবস্থায় ইরাক ও ইরান উভয় দেশের মধ্যেই এই সময়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে এবং জুলাই মাসের দিকে বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ইরান সরকার ইরাক সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। এই খবরটি অবশ্য ইরাকী তথ্য বিভাগ কর্তৃক পরিবেশিত হয়েছিল এবং একই সময়ে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন যে, "অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ও পারস্পরিক মর্যাদা রক্ষার নীতির ভিত্তিতে আমরা ইরানের নয়া কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার অনেক প্রস্তাব দিয়েছি, কিন্তু তা সবই বিফল হয়েছে। অতএব আমাদের নিকট থেকে খোমেনী অতঃপর আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আশা করতে পারেন না। নিজের দেশে যে ঘাতক হিসাবে পরিচিত আমরা তার নিকট মাথানত করতে পারি না। আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু চাপিয়ে দেয়া হলে আমরা এর জবাব দিতে জানি, আমাদের

অস্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকবে না।" ১৯৮০ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে 'লা-মণ্ডে' পত্রিকায় সাদ্দাম হোসেনের এই সাংবাদিক সম্মেলনের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

অতএব খোমেনীর ইরান প্রত্যাবর্তনের পরবর্তীতে উভয় দেশের সম্পর্কের অবনতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তথ্যভিত্তিক যে সর্বশেষ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, ইরাক ও ইরান এই দুইটি মুসলিম দেশই এখন যুদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছে। সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কোন দেশের পক্ষেই অতঃপর আর সম্ভব নয়।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়—কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হল? বস্তুতঃ এই প্রশ্নটিরও দু'টি ভাগ রয়েছে। খোমেনী ও ইরানী বিপ্লবকে এত সাহায্য-সহায়তা করা এবং নয়া ইরানী কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করার পরও খোমেনী সরকার ইরাকের বিরুদ্ধে এত ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন কেন? এবং ইরানের শাহ রেজা মোহাম্মদ পাহলভীই বা কেন শাতিল আরবের দিকে স্বীয় রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট হন। এই প্রশ্নটির জবাব পেতে হলে অনেক অতীতের দিকে যেতে হবে, জানতে হবে, এই পরিস্থিতি সৃষ্টির গোড়ার কথা। অর্থাৎ, ইরাক ও ইরান—এই দু'টি-দেশের বর্তমান যুদ্ধের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি। এই পটভূমি বিশ্লেষণকালে দেখা যাবে যে, শাতিল আরব সংক্রান্ত উভয় দেশের এই বিরোধের কারণগুলি মারাত্মক ধরনের অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর।

এই এলাকার দখলীস্বত্ব নিয়ে ইরাক ও ইরান বহুকাল ধরে পারস্পরিক বিরোধ সতেজ রেখেছে এবং এই বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টা কেবল ব্যর্থই হয় নাই—বরং সমস্যাটি উত্তরোত্তর যেন জটিল হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে যুদ্ধের কারণ নির্ণয় করতে গেলে এই এলাকার, বিশেষ করে শাতিল

আরবের অবস্থান তথা অর্থনৈতিক কারণটিই বড় হয়ে ধরা পড়বে, মনে হবে যেন বাণিজ্যিক সুবিধাদি নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই এই দু'টি দেশ দীর্ঘস্থায়ী এক মারাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই যুদ্ধের আসল কারণ অনেক গভীরে। এর মূলে রয়েছে আরবীস্তানের কাহিনী আর শাতিল আরবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতনসহ শাসনকর্তৃত্ব দখল-বেদখলের ইতিহাস।

এই ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করার আগে আমরা আরবীস্তানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত আহওয়াজ শহরের অবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নামে প্রচারিত একটি ইশতেহারের বিষয় আলোচনা করব। আহওয়াজে আরব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত এই ইশতেহারটি আরবীস্তান সম্পর্কিত আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রকৃত তথ্যাবলী উদঘাটনে সহায়ক হবে। ইশতে-হারে বলা হয়ঃ

পশ্চিম ইরানের একটি বিস্তৃত এলাকা আরবীস্তান নামে পরিচিত। এই এলাকার অধিবাসীদের ভাষা আরবী এবং তারা বিভিন্ন আরব বংশোদ্ভূত। এককালে এই এলাকায় আরবদের কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু পারসিকদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের ফলে এলাকাটি ইরানীদের হাতে চলে যায়। বর্তমান ইরাক-ইরান যুদ্ধের ফলে আরবীস্তানের কতিপয় এলাকা ইরানীদের কবলমুক্ত হয়েছে। এসব এলাকার একটি উল্লেখ-যোগ্য জনপদ হচ্ছে আহওয়াজ। ইরাকীদের মাধ্যমে আহওয়াজ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর এই এলাকার স্বাধীনতাকামী জনগণের আজা-দীর স্বপ্ন নয়াভাবে জাগ্রত হয়েছে। এখন তারা স্বাধীন আহওয়াজ প্রতিষ্ঠার সব প্রস্তুতি সমাপ্ত করেছেন।

সম্প্রতি আহওয়াজে "আরব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রস্তুতি কমিটির"উদ্যোগে আয়োজিত অধিবেশনে পারসিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে সাংগঠনিক

ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্থানীয় আরবদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। অধিবেশনের অপর এক প্রস্তাবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পারস্যের দখলকৃত আহওয়াজের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আরব জনগণের দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলীর বিবরণ নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

প্রিয় দেশবাসী !

অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ আমাদের মাতৃভূমি ও আহওয়াজের স্থানীয় বাসিন্দাগণ পারস্য সাম্রাজ্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। পাহলভী শাসনামলে আমাদের অবস্থা ছিল মজলুম ইরানী জনগণের সমপর্যায়ের। আমরা জাতীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। এক্ষেত্রে আমরা আহওয়াজী আরবরাই অধিক পরিমাণে বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়েছি। অপরপক্ষে ইরানীরাও শাহকে উৎখাত করে এরূপ শাসনব্যবস্থা কায়েমের আশায় যার মাধ্যমে বঞ্চিত জনগণের অধিকার এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সুযোগ লাভ করার লক্ষ্যে বীরত্বের সাথে সংগ্রাম করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা শাহকে উৎখাত করতে কামিয়াব হয়। কিন্তু আমরা আরবরা এরপরও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলাম। বিশেষতঃ খোমেনী ক্ষমতায় আসার পরও। পরিবর্তে আমাদের আহওয়াজী আরবদের উপর পারসিকদের তরফ থেকে চরম আঘাত আসা অব্যাহত রইল। গত চল্লিশ বছর যাবৎ আমরা ইরানীদের হাতে এমনিভাবে নিগৃহীত হয়ে আসছি। খোমেনী ও তার ধর্মীয় নেতৃত্বের দাবীতে উল্লসিত সহকর্মিগণ আমাদের মাতৃভাষা আরবী তথা কোরআনের ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতে নিষেধ করতে শুরু করে।

কিন্তু আমাদের সংগ্রামী জনগণ নবপর্যায়ে ইরান সরকারের অত্যাচারের শিকার হতে অস্বীকার করে। সুতরাং আরবরা জাতীয় মান-

মর্যাদা, স্বাধিকার ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের দেশে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে শান্তিতে বসবাসের এবং স্বাধীন জাতি-রূপে বেঁচে থাকার তাগিদে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। অতঃপর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ ইরাকী জনগণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আহওয়াজী আরবরাও ইরাকী জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে এককাতারে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা সম্বল করে জালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়ায় এবং চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

আজ আমাদের ঐতিহাসিক জাতীয় সংগ্রাম তথা '৮১' সালের ২২শে সেপ্টেম্বর দিবসে আরব প্রশাসন প্রতিষ্ঠা প্রস্তুতি কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, পারসিক শাসনের সব চিহ্ন নির্মূল করে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে পূর্ণাঙ্গ আরব প্রশাসন কায়েম করা হবে। দ্বিতীয়তঃ আহওয়াজের ব্যবস্থাপনা স্থায়ীভাবে আরব প্রতিনিধিগণের কর্তৃত্বে ন্যস্ত থাকবে।

এই অধিবেশনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১১ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা হয়ঃ সাধারণ সম্পাদক—সাইয়্যেদ আদনান আল মুসাভী, সহ সম্পাদক—ফাখের মজিদ আল জুরকানী, সাংগঠনিক সম্পাদক—মাহমুদ হোসাইন মুশারী; সদস্যগণ—ইবনুদ্দাওরাব আল হুব্বী, হাজেব রফরফ আল ফয়সলী, ইবনুশ্যারহানী আততারফী, ইবনুশ্যারহী, ইবনুশ্যায়লাভী, সাদ্দাম হামেদ সহর আল জাবিদানী, মনসুর জাহী এবং সুজা আলী আল জামেল।

পরিশেষে আহওয়াজবাসীদের প্রতি সম্মেলনের আবেদন হল—প্রিয় আহওয়াজবাসী ভাইয়েরা! আমাদের ঐতিহ্যবাহী, আত্মমর্যাদাশীল পূর্বপুরুষদের 'মান-মর্যাদা' দেশের স্বাধীনতা, জাতীয় গৌরব অক্ষুন্ন রাখা ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কায়েম করার উদ্দেশে এবং শান্তি-

শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমবেতভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার জন্য অত্র সম্মেলন আপনাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।

খোদা হাফেজ। আরব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কমিটি, আহওয়াজ।

যুদ্ধের ভৌগোলিক কারণ

এবার আমরা ইরাক-ইরান যুদ্ধের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করব। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, শাতিল আরব এলাকার মালিকানা নিয়ে ইরাক ও ইরানের মধ্যে বহুকাল আগে থেকেই বিরোধ বিদ্যমান ছিল। এই বিরোধ মীমাংসাকল্পে কম কোশেশ করা হয় নাই। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে এই বিরোধ ক্রমশঃ জটিলতর হয়েছে ভিন্ন অপর কোন রূপ পরিগ্রহ করে নাই। ইরাক এই এলাকা সবসময়ই নিজের বলে দাবী করেছে এবং ইরানও একই সুরে দাবী উত্থাপন করে শাতিল আরব এলাকাকে স্বীয় রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্তর্ভুক্ত রাখতে চেয়েছে।

যাহোক, এ পর্যায়ে আমরা সংশ্লিষ্ট এলাকার ভৌগোলিক দিকটি বিবেচনা করব। কারণ, বিরোধীয় পক্ষদ্বয়ের দাবীর যথার্থতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করার জন্য এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পারস্য উপসাগরের ইরানী সীমান্ত থেকে লোহিত সাগরের শার্ম-এল-শেখ পর্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে। এগুলির মধ্যে হরমুজ প্রণালী ও বাক-এল মান্দরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা বস্তুতঃ আরব উপদ্বীপের সীমা নির্ধারণ করেছে। এই এলাকার সার্বভৌমত্বের সাথে স্বভাবতঃই আঞ্চলিক ভারসাম্যতার প্রশ্নটিও জড়িত হয়ে যায়। বস্তুতঃ এই এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ পাঠ করতে গেলে শাতিল আরব, হরমুজ প্রণালী, আরবীস্তান এবং লিসার ও গ্রেটার তানব এবং আবুমূসা এলাকার একটি সাবিক বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এগুলির অবশ্য পৃথক পৃথক সীমাবদ্ধতা

রয়েছে, কিন্তু তথাপি একথা ভুলে যাওয়া যায় না যে, আসলে এ সব এলাকার একটি অবিভাজ্য ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক সত্তা রয়েছে।

শাতিল আরব

প্রথমে আমরা শাতিল আরব নিয়ে আলোচনা করব। এটা আসলে পারস্য উপসাগরের একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল, যা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর কারণে গড়ে উঠেছে। বসরা শহরের ৪৭ মাইল উত্তরে গড়ে উঠা এই এলাকাটির দৈর্ঘ্য ১৩৬ মাইল যা আল কারনাহ্ ও উপ সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত।

এলাকা বিশেষে প্রস্থে শাতিল আরব এক চতুর্থাংশ থেকে তিন চতুর্থাংশ মাইল। হাওয়াইজাহ এলাকা থেকেই এতে পানি আসে। তাছাড়া মোহাম্মারা শহরের কাছে কারুন নদীও এর সাথে মিলিত হয়েছে। এর সাথে যুক্ত আরো অনেক নদী ও জলপথ রয়েছে যা থেকে বসরা ও আরবীস্তানের ভূমির বহুল উপকার সাধিত হয়। এই জলপথগুলির বিশেষত্ব হল যে, এগুলি কোন দিনই শুকিয়ে যায় না, বরং এগুলির পানি থেকে সারা এলাকার উর্বরতা রক্ষিত হয়। এলাকাটির উর্বরতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এ থেকেও বুঝা যায় যে, এখানে মোট ৬৩৫টি নদী-নালা রয়েছে এবং এগুলির উভয় তীরে রোপিত ফলবান খেজুর গাছের সংখ্যা হল মোট এক কোটি চল্লিশ লক্ষ।

শাতিল আরব হল বহির্বিশ্বের সাথে সংযোগকারী ইরাকের একমাত্র জলপথ। এ পথই ইরাক ও উপসাগর তথা মহাসাগরের সাথে যোগা-যোগ রক্ষা করছে। বস্তুতঃ এ জলপথে ইরাকের উত্তর থেকে দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত অবাধে বিচরণ করা যায়। তাছাড়া বহির্বাণিজ্যের প্রশ্নেও ইরাকের নিকট শাতিল আরবের গুরুত্ব অপরিসীম।

একই কারণে বিশেষ করে বসরা শহরে জাহাজ যোগে পৌঁছার জন্য শাতিল আরবই একমাত্র পথ হওয়ায় ইরানের নিকটও শাতিল আরব নিরতিশয় গুরুত্ববহ।

বসরা একটি বিশ্ববিখ্যাত বন্দর নগরী—যার সুনাম ও মর্যাদা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হুশিয়ার ব্যক্তি মাত্রের নিকটই অতি পরিচিত।

নাবিক সিন্দবাদের নাম শুনেনি লেখাপড়া জানা এরূপ লোক বাংলাদেশেও বিরল। সিন্দবাদের বাণিজ্যযাত্রা ও নানা বিপদ উতরে আসার কাহিনী বসরা নগরীকেও রূপ কথার শহরে পরিণত করেছে। বসরা এলাকা প্রকৃতির অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যাবলী সমৃদ্ধ। এদিক থেকে বসরা এলাকাকে "ক্ষুদে পারস্য" বলেও অভিহিত করা যায়। শাতিল আরব থেকে আমারা পর্যন্ত টাইগ্রিসের বদান্যতায় ফুলে-ফলে সুশোভিত বসরা ও উহার পার্শ্ববর্তী সারা অঞ্চল। এটা নানা ধরনের গাছপালার সমারোহ ও পশু পাখীর কল গুঞ্জনে মুখরিত বনাঞ্চল। এসব এলাকায় ঘুরে বেড়াতে গিয়ে মানুষ আত্মভোলা হয়ে যায়, মনে হয় আরব্য উপন্যাসের দৈত্য বুঝিবা এসে গেল। উত্তর ইরাকের লোকেরা এসব এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসে কিছুটা অনিচ্ছুক বলে মনে হলেও এখানকার সব কিছুই মনোরম। মেয়েদের গায়ের রং উত্তর এলাকার চাইতে কিছুটা মলিন হলেও মরু-বেদুইনদের চাহনি ক্ষুদ্রাকায় নিখুঁত নাক ও পুরু ঠোঁট তাদের বৈশিষ্ট্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বসরার একটি অসুবিধা আছে এবং সেটা হল আবহাওয়া সংক্রান্ত গ্রীষ্মকালে এলাকার তাপমাত্রা ১১৮ডিগ্রীতে উঠে যায়। কোন কোন সময় হয়তবা আরও বেশী উঠে। এ সময়ে বাতাসে আর্দ্রতাও থাকে অনেক বেশী। যাহোক এই এলাকার লোক এখন অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এগুলো অবশ্য বেশীর ভাগই শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ এবং এদের হাত সারা এলাকাটিকে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার কাজেই নিয়োজিত। কিন্তু বসরার দক্ষিণ পশ্চিম অংশটি শিল্প কারখানা-তেল এবং উসে-কাসর বন্দরের কারণে সৌন্দর্য পিপাসুদের কিছুটা নিরাশ করে বৈকি। তাছাড়া জুবায়ের সন্নিকটবর্তী যে মরু অঞ্চলে এক সময় পর্যটক ও অবসর বিনোদনকারীরা ঘুরে বেড়াত, আজ সেখানে পিচঢালা মহাসড়কে গর্জন

করে একটির পর একটি ট্রাক ও গাড়ী ছুটে যাচ্ছে কুয়েত, বিমান বন্দর অথবা অন্যান্য বন্দরের দিকে। এতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির রূপ পরিবর্তন ঘটেছে অতি দ্রুত। অনেকের জন্য হয়ত বা এই পরিবর্তন নৈরাশ্যের কারণ হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, ইরাক এখন বিশ্বের অন্যতম তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ। বসরার নদী ছুঁয়ে যাওয়া অংশটি বস্তুতঃ ইরাকীদের কল্পনার ধন। এখানকার পুরাতন বসরা বন্দর, রেলষ্টেশন এবং অল্পদূরবর্তী শাতিল আরব হোটেল ও বসরা বিমান বন্দর দর্শনীয় স্থান। ১৯৬০ সালের দিকে বিমান বন্দরটি সুয়ায়বাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখানকার ফুল, ফলবান গাছ ও পানি ইরাকের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

বসরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ভাগ্যেরও প্রশংসা করতে হয়। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দালান-কোঠাগুলো এরূপ মনোরম স্থানে অবস্থিত যেখানে বিশ্বের দুটি অতি প্রসিদ্ধ নদী ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে। এর ঠিক ২৫ মাইল দূরেই শাতিল আরবের মিলন ঘটেছে পারস্য উপসাগরে। এখান থেকে দেখা যায়, কফিতে দুধ মিশান রংয়ের শাতিল আরবের পানি সাগরের দিকে গড়িয়ে চলেছে; আর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য খেজুর গাছে পাতাগুলি গড়িয়ে পড়ছে পরস্পরের উপর যেন মৃদুমন্দ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে এলোকেশীর অবিন্যস্ত জুলফ।

বন্দরের জেটিতে দেখা যায় ১০ হাজার অথবা ১২ হাজার টনের জাহাজগুলি একের পর এক নোংগর করে আছে। তবে আধুনিক ইরাকের আমদানী-রফতানির গুরুভার এ বন্দরের পক্ষে এখনই অনেকটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায়, জেটি থেকে আরো কয়েক মাইল পর্যন্ত অনেক জাহাজ নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে মাল ভর্তি অথবা খালাস করা অপেক্ষায়।

বসরাকে প্রাচ্যের ভেনিস বলা হয়। কথাটি অমূলক নয়। এখানে বেশ কয়েকটি খাল রয়েছে যার গোড়ার দিকে রয়েছে জলাভূমি। এ-

সব জলাভূমি ও খালের দু'ধারে রয়েছে খেজুর বাগান ও খেজুর গাছের সারি, যার তলায় ইরাকীরা চড়ুই ভাতি খেলে, কার্পেটটি বিছিয়ে দিয়ে নাচ গান আর আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে।

মুসলিমদের হাতে সাসানীয় রাজধানী সিকনের পতন ঘটার পর খলীফা ওমরের নির্দ্দেশে কুফার সাথে বসরা শহরেরও ভিত্তি রচিত হয়। প্রথমে বসরা ছিল একটি সামরিক ছাউনি মাত্র এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল খেজুরের পাতা, ডাল ও কাদা-মাটি দিয়ে। এসবের কোন চিহ্নই এখন আর নাই। পরবর্তীতে জোবায়ের ইবনুল আওয়াম এবং তালহা ইবনে ওবায়দুল্লার কারণে বসরা পুনরায় প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। জোবায়ের ও তালহা এখানে খলিফা আলীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন খলিফা উমর ও খলিফা উসমানের এন্তেকালের পর। বসরার পশ্চিম দিকে তখন একটি যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধে জোবায়ের এবং তালহা উভয়েই নিহত হন। জোবায়েরকে যুদ্ধক্ষেত্রেই কবর দেওয়া হয় যে কবরকে কেন্দ্র করে একটি ছোট শহরও এখানে গড়ে উঠেছে। শহরটির নাম জোবায়ের।

বসরা শহরের সাথে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের কথাও এসে পড়ে: আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাধ্যক্ষ এডমিরাল নিয়ারস বসরার অদূরে একটি পোতাশ্রয় নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এখন সে পোতাশ্রয়ের আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ষোল শতক পর্যন্ত বসরার বড় একটা প্রসিদ্ধিও ছিল না। পনরা শতকের শেষাবধি পর্তুগীজরা পারস্য উপসাগরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু তুর্কী সাম্রাজ্য পূর্বাঞ্চলে সম্প্রসারিত হওয়ার সময় অর্থাৎ, ১৮২০ সালে পর্তুগীজদের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই ইরাক ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর পরবর্তীতে কলম্বাস কর্তৃক নয়া পৃথিবী আবিস্কৃত হওয়ার ফলে ইউরোপীয়দের দৃষ্টি খুলে যায়। এরপর ডিয়াজ এবং ডি গামা পূর্বাঞ্চলীয় রুট আবিষ্কার করলে অনেকে জাহাজ যোগে এই সব দেশে এসে যেসব মোনরম ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন তা অনেক বণিক, পর্যটক ও রাজপ্রতিনিধিদের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে অনেকেই পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলির সাথে সংযোগ রক্ষা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। নৌ-যোগাযোগ তখন অনেক কষ্টসাধ্য ছিল বিধায় অনেকে স্থল পথে গ্রীক এলাকায় আসার চেষ্টা করতে থাকেন এবং এভাবেই নৌ-বাণিজ্যের সাথে সাথে স্থল বাণিজ্যের পরিধিও বেড়ে যায়।

ভারত থেকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় যাওয়ার তখন মূলতঃ দুটি প্রধান ব্যবস্থা ছিল। একটি হল স্থলপথে পারস্য অতিক্রম করে, কুর্দীস্তানের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আলেপ্পো ও বৈরুত পর্যন্ত এবং অপরটি হল জাহাজ যোগে বসরা পেঁাছে ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীর ধরে সামোয়া, লামলাম, হিসকা ও হিল্লা হয়ে বাগদাদ ও আলেপ্পো পর্যন্ত। বসরা থেকে আলেপ্পো পর্যন্ত তখন কেবল উটের সাহায্যেই পথ অতিক্রম করা যেত এবং পথে নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তাই ছিল না। সময় লাগতো ৭০ দিন।

তখনকার বসরা শহরের অবস্থা র‍্যালফ ফিচ নামক জনৈক বৃটিশ ব্যবসায়ীর লিখা থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। ১৫৮৩ সালে র‍্যালফ ফিচ লিখেছেন যে বসরা শহরে কাদার দেওয়াল গাঁথা তখন প্রায় দশ হাজার ঘর বাড়ী ছিল। তাছাড়া আরও ছিল অনেক খেজুর পাতার ঘর। বসরা তখন বিভিন্ন ধরনের মসলা ও মাদক দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। বসরার আশে পাশেই উৎপন্ন হত প্রচুর গম, চাল ও খেজুর। ব্যবিলনসহ সারা দেশ তখন নির্ভর করত এই এলাকায় উৎপাদিত খাদ্য দ্রব্যের উপর।

তুর্কীরা এই এলাকা দখল করার পর বসরাতে একজন গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং এই গভর্ণর ছিলেন বাগদাদে নিযুক্ত পাশার অধীন, এর ফলে বসরার আশে পাশের এলাকা প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন বিদ্রোহী-দের আবাসস্থলে পরিণত হয়। বিশেষ করে বসরার প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে জলাভূমিতে যে আরবরা বসবাস করত তারা কিছুতেই তুর্কী শাসন মেনে নিতে পারে নাই। তারা প্রায়শঃই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাদের দমন করার জন্য পাশা বার বার সৈন্য পাঠিয়েছেন। অনেক সময় এই সৈন্যরা সাময়িকভাবে সফলকামও হয়েছে। কিন্তু শেষ ফলাফলে পরিস্থিতির কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। জলা-ভূমির আরবরা পরাজিত হয়েই জলাভূমির আরো গভীরে চলে গেছে, কিন্তু তা শুধু তাদের ক্ষতস্থান গুলিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য। একটু সুস্থ হয়েই তারা তুর্কীদের আক্রমণ করেছে, এমনকি বসরা আক্রমণ করে শহরটিকে তছনছ করতেও তারা ছাড়ে নাই।

তুর্কীদের উপর অবশ্য আরো বিপদ ঘনায়মাণ ছিল। কারণ, কেবল স্থানীয় আরবদের বিরুদ্ধেই নয়—পারসিকদের বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই করতে হয়েছে এজন্য যে পারসীরাও তখন এই এলাকা দখল করার জন্য সচেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় সারা এলাকাটিই তখন একটি বিপদ সঙ্কুল এলাকায় পরিণত হয়েছিল। তবে ১৬২৪ সালে আলী পাশা পারসিকদের একটি অভিযান পর্যুদস্ত করে বসরায় কিছু কালের জন্য শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন। বসরার এই সময়টিকে ইতিহাসে বাগদাদের হারুনুরশীদের সময়ের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। এই সময়ে বসরা কাব, শিল্পী ও বৈজ্ঞানকদের তীর্থভূমিতে পরিণত হয় এবং বসরার সমৃদ্ধির খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আলী পাশার পুত্র পিতার এই কীর্তিকে ধরে রাখতে পারেন নাই। বসরার পার্শ্ব-বর্তী এলাকাগুলিতে বসবাসরত আরবদের মহিষের উপর কর ধার্য করে তিনি চিরতরে সেই শান্তি বিনষ্ট করে দেন। মহিষের উপর কর

ধার্য কারার ফলে এলাকাটিতে অশান্তি ও বিদ্রোহ পুনরায় দানা বাঁধতে শুরু করে, কিন্তু এক সময়ে পুনরায়, এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন পর্যটক দের বলতে শুনা যেত যে, সারা শহরে অবশ্য আক্রান্ত না হয়েও সারা রাত ধরে ঘুরে বেড়ানো যায়।

এরূপ পরিস্থিতিতেও টেভারনীয়ার নামক জনৈক ফরাসী তখনকার বসরা সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র তুলে ধরেছেন। ১৯৭০ সালে তিনি লিখেছেন যে, বসরাতে হল্যাণ্ডবাসী, বৃটিশ, পর্তুগীজ, তুর্কী এবং সামোর, আলেপ্পো, দামেস্ক ও কায়রোবাসী বণিকদের সবসময় দেখা যেতো। বসরার অধিবাসীরা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপমালা থেকে নানা ধরনের যে সব মসলা নিয়ে আসত এসব বণিকেরা সেগুলি ক্রয় করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। টেভারনীয়ারের বিবরণ মতে বসরার শাসনকর্তা ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং ধনী। প্রধানতঃ উট, ঘোড়া এবং খেজুরই ছিল তার আয়ের উৎস। বিশেষ করে খেজুর থেকে তার যে আয় হত তা ছিল কল্পনাতীত।

বসরার পুরাতন এলাকাটি এখনও নানাভাবেই আকর্ষণীয়। এখানকার আচ্ছাদিত বাজারটির অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং বাজারটি এখনো ঘুরে বেড়াবার মত। এখানকার সবগুলি দোকানই মালে পরিপূর্ণ। দোকান থেকে মসলা, লতাগুল্ম ও কফির সুবাস ভেসে আসে। মনে হয়, এটা যেন পুরাতন এক পৃথিবী।

ফাও এবং উসে কাসরের বন্দর এলাকার সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে বসরার আধুনিকতা সম্প্রসারিত হয়েছে।

আল-জোবায়ের

বসবার কিছুটা পশ্চিমেই জোবায়ের শহরটি অবস্থিত। এই শহরের আশেপাশের গাছের তলায় ইরাকীরা যুগ যুগ ধরে চড়ুইভাতি খেলে এসেছে। বস্তুতঃ এটা ছিল মরুভূমির অংশবিশেষ যা হেজাযের পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। জোবায়ের শহরে রাস্তা-ঘাটের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অনেককেই মুগ্ধ করে। জোবায়ের শহরের অদূরেই বসরার বিমান বন্দর শোয়াইবা নামক এই স্থানটিতেই ১৯১৫-সালে বৃটিশ জেনারেল নিক্সন

তুর্কী বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু শোয়াইবার এই জয় বৃটিশ বাহিনীকে আরও ভয়াবহ সংঘর্ষের পথে ঠেলে দেয় এবং বসরা থেকে কারনা পর্যন্ত অর্থাৎ, শাতিল আরবে যাওয়ার পথেই বৃটিশ বাহিনীকে এই বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

কারনা

শাতিল আরবের তীর ধরে খেজুর গাছের সবুজ বনানী উত্তরের দিকে চলে গেছে ছোট একটি শহরের দিকে যেখানে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী এসে মিশেছে এই শহরটির নামই কারনা। কৌশলগত অবস্থানের কারণে কারনা শহর এলাকায় অনেক অশান্তি ঘটেছে। তুর্কীরা এ শহরে একটি চেক-পোষ্ট বসিয়ে বাগদাদ থেকে আগত অথবা বাগদাদে গমনরত সব মালামালের উপর কর আদায় করত। কারনা আজ একটি ছোট সুন্দর শহর। এখানে একটি রেষ্ট হাউসও রয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এখনও পর্যটকদের নয়ন জুড়ায়।

১৮৩৯ সালের পর থেকে টাইগ্রীস নদীতে তুলনামূলকভবে অধিক কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। জর্জ ক্যাপেলের বর্ণনা মতে, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এই এলাকায় তদীয় সেনাপতি সেলুকাস নিকেতর ১ উত্তারাধিকার গ্রহণ করেন এবং এই সেলুকাসই স্বীয় স্ত্রী এপামিয়ার সম্মানে কারনা শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই শহরটি "বেহেশতের বাগিচা ও মা হাওয়ার গাছ বা জ্ঞানবৃক্ষের অবস্থিতির জন্যও প্রসিদ্ধ।"

কারনা থেকে আমারাতে যাওয়ার রাস্তাটি বেশ উন্নতমানের। এ রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে যে বিস্তীর্ণ সমভূমি পরিলক্ষিত হয় তা বস্তুতঃ ইরানের এলাকায় গিয়ে মিশেছে। এখানে অনেক বড় বড় শিল্প-কারখানাও এখন গড়ে উঠছে। এসব শিল্প-কারখানার অধিকাংশগুলি-

তেই কাগজ ও চিনি উৎপাদিত হচ্ছে?

আমারা

'আমারা' শহরটির নির্জস্বচমৎকারিত্ব তেমন কিছু দেখা যায় না। এই শহরটি মূলতঃ ১৮৬৬ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে গড়ে উঠেছে। শহরটির রাস্তা-ঘাট বেশ প্রশস্ত। এর লোকসংখ্যা হবে দশ হাজার। কিন্তু এই এলাকাটির দুর্ভাগ্য এই যে, দু'টি বিবদমান উপজাতীয় গোষ্ঠী প্রায় শত বছর ধরে পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এই উপজাতি দু'টির নাম হল বনি লাম ও এলবু মোহাম্মদ শেখ। হাজার হাজার লোক এই যুদ্ধে মারা গেছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে একটি বৃটিশ কোম্পানী বসরা ও বাগদাদের মধ্যে ডাক যোগাযোগের জন্য লঞ্চ সার্ভিস চালু করলে তাও এসব উপজাতীয়দের আক্রমণে বাধাগ্রস্ত হয়। যাহোক, তুর্কীরা এসে আমারাতে একটি স্থায়ী সেনানিবাস গড়ে তোলার পর এলাকাটিতে শান্তি অনেকটা ফিরে আসে এবং এর পর থেকেই শহরটির উন্নতি ঘটতে থাকে। এর পরই শুরু হয় তুর্কী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ।

মোহাম্মদ পাশা দাগিস্তানীর নেতৃত্বাধীন তুর্কী সৈন্যরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে উত্তর দিকে পালিয়ে গেলে বৃটিশরা আমারায় এসে প্রথম একটি সামরিক হাসপাতাল স্থাপন করে। বৃটিশরা তখন এখানে ভালই ছিল। কিন্তু কুট আল-আমারাতে জেনারেল টাউনসে পরাজিত হলে তারা বেশ বিপাকে পড়ে। তবে জেনারেল মউণ্ড ১৯১৭ সালে বাগদাদ দখল করলে এই এলাকায় চার শত বছরের তুর্কী শাসনের অবসান ঘটে। বছর চারেকের মধ্যেই এসব ঘটনার সমাপ্তি ঘটে। এই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ইরাকের রাজতন্ত্রের শেষ দিন অবধি জারী ছিল। এরপর ১৯৬৫ সালের বিপ্লবের পর পরিস্থিতি মোড় গ্রহণ করতে থাকে।

তবে বিপ্লব পূর্ব দিনগুলিতে বৃটিশরা প্রকৃতপক্ষে এই এলাকা সরাসরি শাসন করত। তখনও শাতিল আরবে বৃটেনের জাহাজগুলিই

অধিক সংখ্যায় যাওয়া আসা করত। ইংরেজ ও আরব তথা ইরাকীদের কর্মকোলাহলে সদা মুখরিত থাকত শাতিল আরব।

আমারা থেকে কুটের পথে আরো দু'টি ছোট শহর রয়েছে। শহর দুটি হল আলী শারকী ও আলী গারবী। কথিত আছে যে, আলী শারকীতে হযরত আলী (রঃ) এর পদচিহ্ন রয়েছে।

হরমুজ প্রণালী

এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গেলে শাতিল আরব ব্যতীত হরমুজ প্রণালী এবং আরবীস্তানের বিষয়েও আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

উপসাগরের পানি যেখানে গিয়ে সাগরের সাথে মিশেছে, সেখানটাই হরমুজ প্রণালী এবং এটাই আবার এই প্রণালীর কৌশলগত গুরুত্ব। হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রক শক্তি ও তেলখনি এলাকা নিয়ন্ত্রণকারীর মধ্যে সাধারণতঃ কোন প্রভেদ দেখা যায় না এবং পেট্রোলই এখন বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বাধিক ৬০ কিলোমিটার প্রস্থের এই প্রণালীটি দিয়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে তেলবাহী জাহাজ বেরিয়ে যায়, যা বিশ্বের প্রয়োজনীয় শতকরা ৬২ ভাগ তেল সরবরাহ করে। সরবরাহের এই হিসাবের মধ্যে রয়েছে জাপানের শতকরা ৯০ ভাগ, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর শতকরা ৭০ ভাগ এবং আমেরিকার প্রয়োজনীয় শতকরা ৫০ ভাগ তেল। ইরান, কুয়েত, সউদী আরব, কাতার, বাহরাইন, ওমান এবং আমীরাত থেকে উপসাগর দিয়ে হরমুজ প্রণালী ব্যতীত সাগরে পৌঁছার কোন পথ নাই।

অবস্থানগত গুরুত্বের জন্যই এ এলাকা নিয়ে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। এলাকাটি কতিপয় আরব উপজাতির আবাসস্থল। এখনো এই এলাকার মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিকতার ধারা বেদুঈন যুগের আরব সভ্যতার নমুনা বহন করে।

খৃষ্ট্রীয় ২০ শতকের প্রথম ভাগে হরমুজ প্রণালীতে আরবদের আধিপত্য কায়েম হয়। এই এলাকাটি নিয়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির মধ্যে বিবাদ লেগেই ছিল। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৫ শতকের শেষ দিক থেকে ক্রমে এই এলাকায় তুর্কী, পারসিক ও পর্তুগীজদের আধিপত্য কায়েম থাকে। ইংরেজরা এই এলাকা দখল করে ১৬ শতকের প্রথম দিকে।

হরমুজ প্রণালীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোনকালেই কম ছিল না। পরবর্তীতে তেল আবিষ্কৃত হওয়ার পর এর গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে এবং প্রধানতঃ এই অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্যই ইরানের শাহ হরমুজ প্রণালীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে সব সময় সতর্ক ছিলেন। শাহ এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়েই ওমান সরকারের বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমেছেন এবং হরমুজ প্রণালীর দ্বীপগুলিতে সর্বাধুনিক নৌঘাঁটি স্থাপন করেছেন, যেখানে সাবমেরিন পর্যন্ত লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

শাহ এই কাজে কোটি কোটি মার্কিন ডলারের কারিগরি সাহায্য ও যন্ত্রপাতির সহায়তা নিয়েছেন এবং ১৯৭১ সালের ৩০শে নভেম্বর ইংরেজরা হরমুজ প্রণালী পরিত্যাগ করে গেলে শাহ প্রণালীর এবং আশে পাশের দ্বীপগুলি দখল করে নেন। এই সব দ্বীপের মধ্যে লিসার এবং গ্রিটার, তামুর এবং আবু মুসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইরানে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরও ইরানীরা এই অধিকার সংরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ১৯৮০ সালে এই এলাকায় একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এবং বন্দর আববাস থেকে তেলবাহী জাহাজগুলিকে পেট্রোল বোটের সাহায্যে পাহারা দিয়ে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করতে সাহায্য করার ব্যবস্থা করে।

ইরানে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কথাবার্তা ও ইরানী বিপ্লবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে বিশ্বের দুই পরাশক্তি মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া কিছুটা শঙ্কিত হয়ে উঠে বলে মনে হয় এবং এই উভয় শক্তি হরমুজ প্রণালীর দিকে নিজ নিজ নৌবহর পাঠিয়ে দেয়। নৌবহরগুলি তখন থেকে এখন পর্যন্ত হরমুজ প্রণালীর অদূরে সাগর বক্ষে অবস্থান করছে। অবস্থা দৃষ্টে ইরানীরাও যথেষ্ট বিরক্ত হয় এবং যে কোনরূপ বৈদেশিক হামলার মুখে প্রণালীটিকে বোমা বিধ্বস্ত করার হুমকি দিয়ে বসে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ১৯৮০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে পশ্চিমা শক্তিবর্গ তথা ৬ সদস্যের এক কনফারেন্স আহ্বান করে। কনফারেন্সে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রবর্গ হল যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান ও ইটালী।

যাহোক শেষ পর্যন্ত এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত না হলেও একথা কিছুতে সত্য নয় যে, একটি নৌকা ডুবিয়ে দিলেও প্রণালীটি নৌযান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়বে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তেলবাহী জাহাজ চলাচলের পক্ষে হরমুজ প্রণালী যথেষ্ট প্রশস্ত। তাছাড়া এক্ষেত্রে লক্ষ্যযোগ্য যে, জাহাজ চলাচলের জন্য ২০মিটার প্রশস্ততা দাবী করা হলেও প্রকৃত পক্ষে অর্ধেক স্থান হলেই জাহাজ চলাচল করতে পারে। তদুপরি প্রস্থে হরমুজ প্রণালীর অন্যূন ৫০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচল করতে পারে।

অবশ্য এসব কথা ছাড়াও হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার মারাত্মক ভীতির বিষয়টি নিশ্চিতরূপেই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য; কারণ এই প্রণালীটি বন্ধ হয়ে গেলে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশই দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং সেক্ষেত্রে রেষারেষির ফলশ্রুতিতে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি

আরব উপসাগর আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এর গভীরতা অনেক। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই উপসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশ কিছু দ্বীপের সৃষ্টি

হয়েছে। এই দ্বীপগুলি উৎপত্তির ব্যাপারে প্রাকৃতিক কারণই মূলতঃ দায়ী। এই এলাকায় লারাক হেনকাম, তাম্ব আবু মুসা, ফোরায়, সিরি, হালুল এবং আরো অনেক দ্বীপ রয়েছে।

আবু মুসা

আবু মুসা দ্বীপটি আয়তক্ষেত্রাকার। ওমান উপকূলের ধার ঘেঁষে শারজাহ শহর থেকে মাত্র ২৪ মাইল দূরে এই দ্বীপটি অবস্থিত। ইরানী উপকূল থেকে এই দ্বীপটির দূরত্ব ৪৪ মাইল। দ্বীপটি অনেকটা নিম্ন সমভূমির মত। এতে দীর্ঘ বালুকাময় স্থান থাকা সত্বেও সবুজের সমারোহ এখানে লক্ষ্য করার মত। দ্বীপটিতে কতিপয় আগ্নেয় পর্বত থাকলেও এগুলির উচ্চতা একশত মিটারের অধিক নয়। প্রায় হাজার খানেক লোক এই দ্বীপটিতে বসবাস করে। এরা দুইটি আরব উপজাতি বংশোদ্ভূত যার মূল ধারা এসেছে শারজাহ থেকে। কৃষি, পশুপালন ও মাছ ধরাই আবু মূসা দ্বীপবাসীর জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। তবে এদের জীবনেও আধুনিকতার জোয়ার এসেছে এবং তা ইরানের দখলে আসার পর থেকেই।

গ্রেটার তাম্ব ও লিসার তাম্ব

হরমুজ প্রণালীর বাব আল-সালামের প্রবেশপথে রয়েছে গ্রেটার তাম্ব। রাস আল-খই-মাহ আমীরাতের মাত্র ১৯ মাহল দূরে এই দ্বীপটি অবস্থিত। এর আয়তন ৩৫ বর্গ মাইল। রাস আল খাইমাহ আমীরাতের শাসনাধীন এই দ্বীপটির লোকসংখ্যা আট শত। এরা পশুপালন করে এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এই দ্বীপটির ৬ মাইল পশ্চিমে হরমুজ প্রণালীতেই রয়েছে লিসার তাম্ব নামক অপর একটি দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং প্রস্থে আধা মাইল আয়তনের এই দ্বীপটির আরব অধিবাসীরা জেলে ও পশুপালক।

বিশেষ করে অবস্থানগত কারণেই হরমুজ প্রণালীর এই দ্বীপগুলি ভূমধ্যসাগরের জিব্রালটার এবং লোহিত সাগরের এডেনের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমীরাতের উপকূল ধরে অবস্থিত এই তিনটি দ্বীপই বস্তুতঃ সংযুক্ত আরব আমীরাত, কাতার, বাহরাইন, সউদী আরব, কুয়েত, ইরাক ও ইরানের পর্যবেক্ষণ চৌকিবিশেষ। কোন দেশ এই দ্বীপগুলিতে নিজের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে হরমুজ প্রণালীর কর্তৃত্বও সরাসরি সে দেশের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়, যার ফলে সারা এলাকার উপর দেশটির রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এই দ্বীপগুলি খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। আলওয়ান, আলওয়াদী, আজাহাবী, নামক একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান বছরে আড়াই লক্ষ ডলারের বিনিময়ে এই দ্বীপগুলির খনিজ সম্পদ আহরনের একক কর্তৃত্ব লাভ করেছে। শারজার বর্তমান শেখের চাচা সালেম বিন সুলতান বর্তমান শতকের প্রথম দিকে এই কোম্পানীটিকে উক্ত সুবিধা দেন কোম্পানীটি এখন এই এলাকা থেকে প্রধানতঃ আয়রণ অক্সাইড উত্তোলন করে থাকে যা প্রসাধনী প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়।

আল-কাসেম উপজাতি

ওমানের সাথে এই তিনটি দ্বীপের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সারা এলাকাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই ভাগ্যবরণ করে এসেছে। ১৮ শতক থেকে ১৯ শতকের প্রথমাবধি পর্যন্ত ওমানের সমৃদ্ধির তুলনা ছিল না। উপসাগরটির কূল থেকে তখন আল কাসেম নামক একটি আরব উপজাতির আধিপত্য ছিল। তাদের মূল কেন্দ্র ছিল রাস আল খাইমাতে। কিন্তু সুলতান বিন সাকরের সময় এই কেন্দ্র তথা রাজধানী শাজাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই আল কাসেম উপজাতিটি উপসাগরীয় এলাকার বৃটিশ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর যুদ্ধ করে। কিন্তু ইংরেজরা তাদের শেষ পর্যন্ত পরাজিত করে এবং রাস আল-খাইমাহসহ তাদের অন্যান্য দুর্গগুলি দখল করে নেয়। এই সময়ের যুদ্ধে আল কাসেম গ্রুপের নৌযানগুলি অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে গেলে ইরানীরা এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে এবং ১৮৮৭ সালে আল কাসেম উপজাতির নিকট থেকে সিরিয়ার আধিপত্য কেড়ে নেয়। সিরি দ্বীপটি আবু মুসার পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং এটা ছিল শারজাহ আমীরাতের অধীন। ইরানীরা অতঃপর বনি ইয়াস আরব গোত্রের নিকট থেকে হেনকাম দখল করে নেয়। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য যে, পশ্চিম দিকে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেও ইরানীরা তখনও পর্যন্ত উপরোক্ত দ্বীপ তিনটিতে আধিপত্য বিস্তারের চিন্তা করে নাই এবং এই কথাটি কলিকাতা হইতে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত লরিমায় রচিত। "গাইড টুদি গালফ" পুস্তকেও স্বীকৃত হয়েছে। তদানীন্তন ভারত সরকার এই গাইড রচনার জন্য লরিমারকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাকে এতদসম্পর্কিত সব গোপন দললীপত্রাদি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

ইরানী অনুপ্রবেশের ফল হিসাবে ২০ শতকের প্রথমদিকে আরব ব্যবসায়ীরা ওমানের দিকে সরে গেলে লানজা বন্দরটি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে অবশ্য আরবরা আবু মূসা দ্বীপটির উন্নতি সাধন করে দ্বীপটিকে একটি ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে এই দ্বীপটি ব্যবহারের অনুরোধ জানায়। এবং ফলে আবু মূসা অতি দ্রুত ইরানী বন্দরগুলির প্রতিদ্বন্দী হয়ে দাঁড়ায়।

১৯০৪ সালে মোজাফিরি নামক একটি ইরানী জাহাজ আবু মূসার বন্দরে নোঙ্গর করে। জাহাজটিতে একজন উচ্চ পদস্থ বৃটিশ অফিসার ছিলেন তার নির্দেশে ইরানী পতাকা উড্ডীয়মান রেখে শারজার

পতাকা নামিয়ে ফেলা হলে শারজার শেখের পক্ষ থেকে এই শত্রু-তামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার অফিসারটির কার্যকলাপ সমর্থন না করলে ইরানী জাহাজটি আবু মুসা ত্যাগ করে। প্রায় তিন মাস ধরে এই অনিশ্চিত অবস্থা চলছিল।

শাহ কর্তৃক তিনটি দ্বীপ দখল

ইরানীদের এই প্রলুব্ধ অবস্থা লক্ষ্য করে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ইরানীদের সিরি ও হেনকাম দখলের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এর ফলে ২০ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইরানীরা এই এলাদখল নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু ১৯৭১ সালে বৃটিশরা পারস্য উপসাগরের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ছেড়ে গেলে পরিস্থিতি ইরানের শাহের জন্য অনেকটা সহজ হয়ে আসে। শাহ তখন পশ্চিমা শক্তিবর্গের সাথে এই এলাকার নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির প্রতি স্বীয় সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্বীপ তিনটি দখল করে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের সম্মতি আদায় করেন। এই সময়ে অবস্থা বুঝে উপসাগরীয় দেশগুলিও নিজেদের মধ্যে একটি ফেডারেশন গঠনের ব্যাপারে ঐক্য মতে পেঁৗছে। কিন্তু এই ফেডারেশন গঠনের বিষয়টি ঘোষণা করার পূর্ব মূহূর্তে ১৯৭১ সালের ৩১ শে নভেম্বর তারিখে শাহ অতিক্রত দ্বীপ তিনটি দখল করে নেন।

আরবীস্তান

ইরাক ও ইরানের মধ্যকার বর্তমান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুদ্ধের কারণ হিসাবে ইরানের শাহানশাহ কর্তৃক পূর্বোল্লেখিত দ্বীপ তিনটি জোরপূর্বক দখলের বিষয়টি উল্লেখ করা গেলেও একটি বিষয় কিছুতেই অনুল্লেখিত রাখা যায় না ইরাক ও ইরানের সংঘর্ষের মূল কারণ প্রধানতঃ আরবীস্তান সংশ্লিষ্ট।

এই এলাকাটিতে আরবরা বসবাস করলেও ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, বিদেশী শক্তিগুলো এই এলাকাটি দখল করার চেষ্টা বরাবর করে এসেছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে দখল করেও রেখেছে। ইরাকের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকাটি আরবিস্তান নামে পরিচিত। এর উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে রয়েছে জাগ্রোস পর্বতশ্রেণী। প্রায় ৬২০ মাইল বিস্তীর্ণ এই পর্বতমালার প্রস্থ ন্যূনধিক ১২০ মাইল। উচ্চতায় এই পর্বতগুলি ১১০০ থেকে ১৭০০ মিটার। বস্তুতঃ এই পর্বতশ্রেণী আরবিস্তানের পেছন দিকে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলে এটাই ইরাক ও ইরানের আকৃতিগত ভূসীমা।

আরবিস্তান পশ্চিমে বসরা ও মিসান পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দক্ষিণে রয়েছে আরব উপসাগর। এই আরব উপসাগর কথাটি এখানে বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। সাধারণভাবে ইতিহাস ও ভূগোলে এমনকি ভূমণ্ডল তথা সারা পৃথিবীর মানচিত্রেও এই উপসাগরটিকে পারস্য উপসাগর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

অথচ এটা একটা বাস্তব সত্য যে, এই উপসাগরটি এমন একটি এলাকায় অবস্থিত যেখানকার অধিবাসিগণ জাতি হিসাবে আরব এবং এটি আরবিস্তান এলাকায় অবস্থিত। কিন্তু তথাপি এই উপসাগরটিকে বিদেশী রচিত মানচিত্র পারস্য উপসাগর হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং এ ঘটনা ও এ এলাকার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এই এলাকার উপর বিদেশীদের আকর্ষণ থেকে সারা বিষয়টিকেই পরিকল্পিত বলে সংশয় প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের অববাহিকা শাতিল আরবের পশ্চাদভূমি তথা আরব উপসাগরের মূল ভূখণ্ড সেই উপসাগরটিকে আরবিস্তান এলাকার অংশবিশেষ হওয়া সত্ত্বেও আরব উপসাগর নামে অভিহিত না করে পারস্য উপসাগর হিসাবে চিহ্নিত করার পেছনে গরজের প্রশ্নটিকে উপেক্ষাই বা করা যায় কি

ভাবে ? তদুপরি যেখানে স্থানীয়ভাবে এই উপমহাসগরটিকে অ. উপসাগর হিসাবে অভিহিত করা হয় সেখানে নিজেদের ইচ্ছামাফিক কে এলাকার নামকরণ করা গরজের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করে।

যাহোক আমরা আরবিস্তান প্রসঙ্গ বর্ণনা করছিলাম। এলাকা দৈর্ঘে ২৬৩ এবং প্রস্থে ২৩৮ মাইল। এর মোট আয়তন ৭১,৪৩০ ব মাইল। লোক সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। এদের পূর্বপুরুষরা সবাই আরব উপদ্বীপের এলাকাগুলি থেকে বিভিন্ন সময়ে এই এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং সে সময়টা অবশ্যই ইসলামের আবির্ভাবেরও আগে।

বস্তুতঃ আরবিস্তানের আরবী মূল নাম হ'ল "আহ্ওয়াজ" বা "হাওজ" শব্দ থেকে এসেছে। হাওজ শব্দটি আবার এসেছে "হাজা ইয়াহুজ" শব্দ থেকে যার অর্থ হল যথাযথ, উপযুক্ত সঠিক অথবা বিশেষ উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রাখা। এটা হল আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সময়-কার কথা। আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে এসব এলাকা জয় করে পারস্য সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন এবং ভারত পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। গোটা উপমহাদেশ তখন ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল। এসব এলাকা দখল করে আলেকজাণ্ডার বিজিত এলাকাকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। তখনই আরব অধ্যুষিত এই এলাকাটিকে আহ্ওয়াজ নামে অভিহিত করা হত যার মর্মার্থ ছিল যে, এই এলাকাটি বিশেষ করে আরব অধ্যুষিত স্থান।

পরবর্তীকালে পারসিকরাই এলাকাটিকে খুজিস্তান নামে অভিহিত করতে শুরু করে। খুজিস্তান শব্দটির অর্থ হল দুর্গ ও সংঘর্ষের এলাকা। এর একটি কারণ এই ছিল যে, আরবরাই এলাকাটিতে অনেক দুর্গ নির্মাণ করে এসব দুর্গ থেকে পূর্ব দিকে বিজয় অভিযান পরিচালনা করত। অথচ উল্লেখ্য যে, সাফাইদ বংশের রাজত্বকালে এই এলাকাটিকে আরবিস্তান নামেই অভিহিত করা হত।

রবিস্তান এলাকাটিতে প্রথম দিকে অর্থাৎ, পূর্বকালে শহরাঞ্চল একটা ছিলই না। যা ছিল সেগুলিকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ক করা যেত। এই শহরগুলির কিছুসংখ্যক ছিল উত্তরাঞ্চলে এবং ন্যগুলি ছিল দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু ১৯০৮ সালে মসজিদ ায়মান অঞ্চলে তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে তৃতীয় একটি রাঞ্চল গড়ে উঠে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য যে, আরব উপসাগরের ত এ শহরগুলির নামও বিজেতা বিদেশীরা নিজেদের সুবিধার্থে তথা এলাকার নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে এলাকাটিতে নিজেদের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করার স্বার্থে অনেকবার রদ বদল করে। বিশেষ করে ষড়যন্ত্র উদঘাটিত করে এলাকার প্রকৃত অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার জন্যও এমতাবস্থায় এই অঞ্চলের শহরগুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

আবাদান

এই এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য শহর হল আবাদান। বস্তুতঃ আবাদান নামটি তুলনামূলকভাবে নতুন। দ্বীপের নাম অনুসারেই দ্বীপটিতে অবস্থিত শহরটির নামও আবাদান রাখা হয়েছে। কিন্তু এর আসল নাম ছিল খোদর দ্বীপ। আবাদান নামটি পারসিক দ্বীপ মোহাম্মারা শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তবে উল্লেখ্য যে, এখানকার আবাদান বস্তুতঃ একটি বন্দর বিশেষ যার মাধ্যমে আরবিস্তান এলাকার তেল বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় রফতানী হয়ে থাকে।

খোদর দ্বীপের চারিদিকে রয়েছে শাতিল আরবের পানি। দ্বীপটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এবং এই দ্বীপটির বয়সও হয়েছে অনেক। প্রাচীনকালে বহু পর্যটক এই দ্বীপটি সফর করেছেন। কারণ, এটি প্রকৃত অর্থে বসরা এলাকারই অন্তর্গত। এই দ্বীপটিতে গড়ে উঠা আবাদান শহরটিকে সাধারণভাবে ইরাকের সীমান্ত শহর হিসাবে বিবেচনা করা হত। প্রসঙ্গতঃ

ইরাকে প্রচলিত প্রবাদের কথাও এখানে স্মরণ করা যেতে পা
"আবাদানের পেছনে আর কোন গ্রাম নেই।'

আল মোহাম্মারাহ্

আরবিস্তানের অপর গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটির নাম হ'ল আল-মোহাম্মার ফারসীতে এর নাম দেয়া হয়েছে খুররম শহর। কারুন নদী যেখা শাতিল আরবে এসে মিলিত হয়েছে, শহরটি সেখানে অবস্থিত। এ বন্দরটির আর্থিক পরিবেশ মোটামুটি ভাবে বসরা এলাকার উপর নির্ভর-শীল। হাজী ইউসুফ বিন মা'বাদ নামক বেঁা গোত্রের জনৈক আরব শেখ এই শহরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তা হল ১৮১২ সালের কথা। হাজী ইউসুফ এই শহরটিতে স্বীয় গোত্রের রাজধানী স্থাপন করেন। তিনিই শহরটিকে আল মোহাম্মারাহ নামে অভিহিত করেন। আরবী মোহাম্মারাহ শব্দটির অর্থ হ'ল লাল রং। সম্ভবতঃ কারুন নদী যোগে লাল রংয়ের মাটি ও বালু এই স্থানটিতে এসে জমাট হয় বলেই তিনি শহরটির এরূপ নামকরণ করেছিলেন। আল মোহাম্মারাহ বন্দরটির অনেক সংস্কার হওয়ায় এবং কারুন নদীতে খনন কাজ হওয়ায় বড় বড় নৌযানগুলিও এখন অতি সহজে এই বন্দরটিতে যাতায়াত করতে পারে। এই এলাকার অপরাপর শহরগুলি হ'ল আল-আহওয়াজ, আল-হাওয়াইজাহ, দেজফুল, ফেলিহিয়াহ ও তাস্তর। এই শহর ও সংলগ্ন এলাকাগুলির বর্তমান ফারসী নামও পূর্ববর্তী আরবী নাম থেকেই বস্তুতঃ আরবিস্তান এলাকার জটিলতার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়।

শাতিল আরবের উভয় তীরেই রয়েছে সমতল ভূমি এবং এই জমি-গুলি খুবই উর্বর। এই সম্পূর্ণ জনপদটিই আবার উত্তর দিকে ঘোড়ার খুর আকারের দু'টি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এলাকাটি দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে উপসাগরে গিয়ে মিশেছে। বস্তুতঃ সারা এলাকাটিই আসলে আরবিস্তানের সমভূমি। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত

। : অতীত ও বর্তমান" গ্রন্থের লেখক ডোনাল্ড উইলবার লিখেছেন দক্ষিণ ইরাকের নিম্ন সমভূমিটিই আসলে আরবিস্তানের সমভূমি নামে চিত। এলাকার বিভিন্ন নদী সহযোগে জমাট বাঁধা পলিমাটির দ্বারা ষ করে, কারুন এবং কায়থেহ নদীর পলিমাটি দিয়েই এই সমভূমি ত হয়েছে। ডোনাল্ড উইলবারের মতে এক সময় ছিল, যখন রবিস্তান ও ইরাকের অনি-নামিরিয়া এলাকাটির অংশ বিশেষ পানিতে ডুবে যেত। তখন অন্যান্য এলাকা থেকে আগত কিছু লোককেও ইউ-ফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্তী নিম্নাঞ্চলে বসবাস করতে দেখা যেত এবং আরবিস্তানের জন্ম হয়েছিল মূলতঃ তখন থেকেই। তবে ডোনাল্ড উইলবার একথাও লিখেছেন যে, সারা এলাকাটি আসলে একই এলাকার অংশ এবং আরবদের পারস্য বিজয়ের সময়ে এসব এলাকাও আরবদের দখলে আসে। সংশ্লিষ্ট এলাকাটি তেলের দিক থেকেও খুবই সমৃদ্ধ এবং এই এলাকায় মোট ৬৮ বিলিয়ন ব্যারেল তেল জমা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে এই এলাকা থেকে আহরিত তেলের বার্ষিক পরিমাণ ২ থেকে ৩ মিলিয়ন ব্যারেল।

এমতাবস্থায়, এই আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি বিষয় বেশ স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে আরবিস্তানকে আরব এলাকা হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু তথাপি লক্ষ্যণীয় যে, এই এলাকাটি ইরাক ও ইরানের মধ্যে বিরোধীয় এলাকা হিসাবে অনেক আগে থেকেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সে তিক্ততার সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয়েছে ইরাক ও ইরানের মধ্যকার বর্তমান ভয়াবহ সশস্ত্র সংঘর্ষ।

কিন্তু আরবিস্তান এলাকাটি ইরাক ও ইরানের মধ্যে বিরোধীয় এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হল কেন এবং কিভাবে?

আরবিস্তানের ইতিকথা

এই বিষয়টি বুঝতে হলে বহু আগেকার বিভিন্ন ধরনের ঘটনাবলীর কথা জানতে হবে যা শুরু হয়েছে খৃষ্টের জন্মেরও হাজার বছর আগে থেকে।

এটা হল আরবিস্তান এলাকার জন্মলগ্নের কাহিনী। এরও সংশ্লিষ্ট এলাকাটি ছিল সাগরের অংশ মাত্র। সাগর বক্ষ থেকে উঠার পর সেমিটিক বংশোদ্ভূত কিছু লোক এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। এরপর আসে আরবের বনী আল-আম গোত্রের লোকজন। এই গোত্রেরই একটি বিখ্যাত শাখা হল বনী তামিম। দক্ষিণ আরবিস্তান এলাকায় এই বনী তামিম গোত্রের লোকজন এখনও বসবাস করে।

বনী আল-আম গোত্রের পূর্ব দিক থেকে এলামিয়ানরা এসে এলাকাটি দখল করে নেয়। কিন্তু হামুয়াবীর রাজত্বকালে বেবিলনবাসীরা এলামিয়ানদের তাড়িয়ে দেয়। এরপর আসিরীয় রাজ্য গঠিত হলে চালদিয়ানদের আগমন পর্যন্ত এলাকাটির স্বাধীনতা মোটামুটিভাবে অক্ষুন্ন ছিল। ২৪১ খৃষ্টাব্দে এলাকাটি পুনরায় আক্রান্ত হয়েছিল। তবে এই আক্রমণ এসেছিল সাসানীয়দের কাছ থেকে। সাসানীয়রা ছিল পারসিক বংশোদ্ভূত। কিন্তু আরবিস্তানের অধিবাসীরা এই আক্রমণের বিরুদ্ধে এত তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যে, সাসানীয়রা শেষ পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং এলাকাটির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে একটি সমঝোতা আসে।

এই পর্যায়ে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সাসানীয়রা দীর্ঘকাল ধরে আরবিস্তান এলাকাটি দখল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও এলাকাবাসীর জীবনে তারা কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নাই ; কারণ, এতদঞ্চলের তৎকালীন জীবনধারা সম্পর্কে যত গবেষণা চালানো হয়েছে তার প্রতিটিতেই একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, চার শত খৃষ্টাব্দের সূচনা অবধি আরবিস্তান এলাকার অধিবাসীরা

তাদের আচার-ব্যবহার, বেশভূষা এবং ব্যবহারিক জীবনের সকল পর্যায়ে আরব বেদুঈনদের রীতিনীতি ও জীবন যাপন প্রণালী অক্ষুন্নই রেখেছে। বস্তুতঃ এই সব গবেষক ও পর্যটকদের মতে মেসোপটেমিয়ার নিম্নাঞ্চল ও আধুনিক আরবিস্তানের সারা এলাকাটি মূলতঃ একই ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকা দিয়েই পর পর কতিপয় প্রাচীন সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল যা বিশ্ববাসীর নিকট সুমেরীয়, আক্কাদীয় এবং বেবিলনীয় সভ্যতা নামে পরিচিত।

আরবীয় সভ্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এই নামে অভিহিত হওয়ার পূর্বেকার সভ্যতাগুলির মৌলিকত্ব এতে সংরক্ষিত হয়েছে এবং এর ফলে কথাটিকে এভাবেও উল্লেখ করা যায় যে, কতিপয় সভ্যতার মৌলিক ভিত্তিগুলির একত্র সন্নিবেশিত অবস্থা শেষ পর্যন্ত আরব সভ্যতা নামে অভিহিত হয়েছে।

সংযোজনের এই পদ্ধতি ইসলামের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত বজায় ছিল যখন মুসলমানগণ পারস্যসহ সংশ্লিষ্ট সংগুলি এলাকাই দখল ল। 'ডিসকভারী অব দি এ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা' পুস্তকের ১৬৬ পৃষ্ঠায় জ্যাকুলিন বেরাইমি লিখেছেন যে, আরবরা ছিল আরব উপসাগরের উপকূলের আসল অধিপতি। সাগরের প্রসঙ্গ আসলেই পারসিক বাদশাগণ ভীত হয়ে উঠতেন। তারা কোন দিন সাগরের ধারে কাছে ঘেঁষতেন না। তবে উপকূলবর্তী এলাকায় আরবদের আধিপত্যকেও তারা কোন দিন সুনজরে দেখেন নাই।

পারসিকদের সমুদ্রভীতি সম্পর্কে স্যার পারসি সাইকেসও অনুরূপ ধরনের কথাই বলেছেন। লণ্ডন থেকে ১৯২১ সালে প্রকাশিত 'এ হিষ্টরী অব পারসিয়া' গ্রন্থের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় স্যার পারসি লিখেছেন যে, মানুষের চরিত্র ও ব্যবহারের উপর প্রকৃতির প্রভাবের বিষয়টি

বুঝতে হলে পারসিকদের সমুদ্রভীতির বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যা থেকে তারা পাহাড়ের ব্যবধানে পৃথক।

এই মন্তব্য থেকেও পানি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরব ও পারসিকদের সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে। পানির প্রতি আরবদের সহজাত আকর্ষণের কারণ হল জীবনযাত্রার শুষ্ক মরুভূমিময় পরিবেশ। মূলতঃ পানি-হীন কষ্টকর পারিপার্শ্বিকতার কারণেই আরবরা পানির প্রতি চির-দিন দুরন্ত আকর্ষণ অনুভব করেছে এবং সাগরের মাঝেও প্রস্রবণের শান্তিময় শীতলতা অনুভব করতে চেয়েছে। অতএব মরুভূমি থেকে সাগরের পথে সংগ্রামই হল আরবদের জীবন। দক্ষিণাঞ্চলের আরব উপজাতিগুলি একারণেই উত্তরের উপকূলবর্তী ভূ-ভাগের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আরবদের আরবিস্তানে প্রবেশের এটাই ঐতিহাসিক কারণ। আরবিস্তানের উর্বরতাই আরবদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় টেনে এনেছে।

পারস্যের প্রাকৃতিক পরিবেশে অবশ্য বৈচিত্র্য রয়েছে। এই এলাকায়ও মরুভূমির আবহাওয়া রয়েছে। তবে, দেশটির অধিকাংশ এলাকায় নদ-নদী প্রবাহিত থাকার ফলে পারস্যবাসীরা সাগরের প্রতি জরুরী আকর্ষণ অনুভব করে না এবং জীবন ও সভ্যতার প্রয়োজনে না হলে হয়তো বা তারা কোনকালেই জাগ্রোস পর্বতমালা অতিক্রমও করতো না।

এই এলাকায় বিকশিত সভ্যতার সাথে পানির সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। কলেজ ডি ফ্রান্সের প্রফেসর এডওয়ার্ড ভরমে বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন, সুমেরিয়ান ও আক্কাদিয়ানদের বিশ্বাস ছিল যে, আরবিস্তান এলাকাটির অপর দিকে পানির একটি সীমাহীন উৎস রয়েছে। সেই পানির উপর এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি ভেসে বেড়াচ্ছে।

এলাকাটির পুরাতন ইতিহাস বিশ্লেষণের ব্যাপারে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর একটি মানসিক প্রভাবও রয়েছে। তাছাড়া-আরও দেখা যায় যে, আরবিস্তান এলাকায় ইরানীদের অনুপ্রবে-

শের পর থেকে এই এলাকার জন-জীবনে একটি নতুনত্ব দেখা দেয় এবং এর পর থেকেই এলাকাবাসীদের সাথে তাদের কলহবিবাদ শুরু হয়। আরবরা যখন এই এলাকায় প্রথম বসবাস শুরু করে, তখন ধর্মীয় কারণে কোনরূপ অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটা হল যীশুখৃষ্টের জন্মের অনেক আগের কাহিনী। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগের এবং পরের কথা হল যে, আরবিস্তান এলাকায় প্রথমে বনী তামিম গোত্রের লোকজন বসতি স্থাপন শুরু করে, পরে পানির সন্ধানে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও এখানে আসতে থাকে। এ বিষয়ে ম্যাক্সিম রডিনসনের কথা হল যে, আরবিস্তান এলাকাটিতে আরব উপজাতিগুলির সার্বিক আধিপত্যের বিষয়টিকে কিছুতেই খাটো করা উচিত নয়। কারণ, ইসলাম ধর্মেরও অনেক আগে থেকেই তারা এখানে আসতে শুরু করে এবং স্থানীয় হিসাবে বসতি স্থাপন করে। বিশেষ করে মেসোপটেমিয়ার অধিকাংশ এলাকা তারা দখল করে নিয়ে ছিল যীশুখৃষ্টের জন্মের ৬ শত বছর আগে।

ইসলামিক বিশ্বকোষের ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত খুজিস্তান সম্পর্কিত নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, এই এলাকাটিতে আরবদের উপস্থিতি বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তারের সময়ে ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আরবগণ কর্তৃক এলাকাটি বিজিত হওয়ার পর থেকে। তখন থেকেই আরবিস্তান আরব এলাকার একটি প্রদেশ হিসাবে বিবেচিত থাকে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা মতে বাহরাইনের সাথে যুক্ত করে হারকাস বিন জোহাইরের শাসনাধীনে রাখা হয়। কিছুকালের জন্য এলাকাটিকে আবার বসরার সাথেও সংযুক্ত করে রাখা হয়েছিল। এই কারণেই উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় যুগে এলাকাটি অনেক অশান্তির শিকার হয়েছে যার মধ্যে খারিজী, কারামাতি এবং হাঞ্জদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাঞ্জরা ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আরবিস্তানের বেশ কয়েকটি শহর ধ্বংস করে দেয়।

৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ অনেকটা স্বাধীন হয়ে উঠেন। খলীফা আবুল-আব্বাস আল-মোকতাদিরের সময়ে বনী হামদান মসুল দখল করে নেয়, ইবনে ওয়াছিক দখল করে বসরা এবং আল-বৃদি আরবিস্তান এলাকায় প্রভুত্ব কায়েম করে। এই সময়ে বাগদাদ ও তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যতীত অপরাপর এলাকায় খলীফার প্রভাব খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে সেলজুকরা আল-বৃদির প্রভাব বিনষ্ট করে এলাকাটি হস্তগত করে।

যাহোক, এসব আলোচনা-বিশ্লেষণ থেকে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংকটে আবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এলাকাটিতে আরবদের আধিপত্য সব সময়েই অক্ষুন্ন ছিল এবং বিশেষ করে উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে এলাকাটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে একটি ভৌগোলিক একক সত্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়।

আববাসীয় খেলাফতের পতনকাল পর্যন্ত আরবিস্তানের আরবী বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলরা আববাসীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়। এর পর থেকেই বস্তুতঃ আরবিস্তান স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারাতে শুরু করে।

১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে মৌছাছিয়াহ বংশ আরবিস্তানে প্রভুত্ব কায়েম করে। মোহাম্মদ আল-মৌছাছিই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশটিকে রাবিআহ নামক একটি আরব বংশের উত্তরসুরী বলে উল্লেখ করেছেন। মৌছাছিই একটি আমীয়াতের পত্তন করেন এবং হাওয়াজাহ্ শহরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তৎপুত্র মোহসিন আমীরাতের দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজধানী স্থাপনের জন্য আল-মোহসেনিয়া নামক একটি নয়া শহর গড়ে তোলেন। এই মোহসিনই আরবিস্তানে স্বীয় আধি-

পত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে পৃথক মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং ইরাকের সাথে সম্পর্ককে সুসংহত করে তোলেন।

মৌছাছিয়াহ নামক আরব বংশটি যখন আরবিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করছিল ইসমাঈল আল-সাফাভী তখন পারস্যে সাফাওয়ীদ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশটিই শেষ পর্যন্ত ওসমানিয়া বংশের কার্যকর বিরুদ্ধশক্তি হিসাবে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠে। উসমানিয়া ও সাফাওয়ীদ সাম্রাজ্যের মধ্যে পরবর্তীকালে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধে আরবিস্তানও ছিল অন্যতম রণক্ষেত্র। তবে মোবারক বিন আবদুল মোতালিব বিন বদর আন ক্ষমতায় আসার পর ১৫৮৮ থেকে ১৬১৬ খ্রীঃ দেজফুল ও তাস্তর পুনরায় অধিকার করেছিলেন। ১৬০৪ খ্রীঃ এই এলাকা সফরকারী পুর্তগীজ পরিব্রাজক পেড্রোতৈইস কৈইরা লিখেছেন—শাতিল আরবের পূর্বাঞ্চলীয় সবটুকু এলাকা মোবারক আবদুল মোতালিবের শাসনাধীন ছিল। তিনি পারসিক ও তুর্কীদের হাত থেকে স্বীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলতেন। তবে পর্তুগীজদের সাথে তার একটি সামরিক চুক্তি ছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, পর্তুগীজরা এই সময়ই আরব উপসাগরীয় এলাকায় আগমন করেছিল। এই সময়কার পিয়েট্রো ডিলাভেল নামক অপর একজন সফরকারীর প্রদত্ত বিবরণও এ প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে, ১৬৩৪ থেকে ১৬৪৩ সালে মনসুর এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। শাতিল আরব তার এলাকাভুক্ত ছিল। কর আদায় না করে কোন জাহাজকে তিনি শাতিল আরবে প্রবেশ করতে দিতেন না। বসরার গভর্ণরের সাথে তিনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং আরবিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে শাহ সাববাসের নাক গলানোর সব প্রচেষ্টা তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, জমির উর্বরতা ছাড়াও আরবিস্তানের একটি পুরাতন ইতিহাস

রয়েছে যা বিভিন্ন সভ্যতার, বিশেষ করে আরবী সভ্যতার দানে সমৃদ্ধ এবং পারসিকরাসহ অনেক বিদেশী শক্তিই এই অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বের বিষয়ে সচেতন ছিল এবং এই কারণেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা তারা প্রাচীনকাল থেকেই করে আসছিলেন। তাছাড়া এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, শত বার যুদ্ধ-বিগ্রহের পরও কিছুতেই এই এলাকা চিরস্থায়ীভাবে দখল করে নিতে সক্ষম হয় নাই এবং আরবিস্তান বরাবরই স্বীয় আরব বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেছে।

তবে, এখানে এ প্রশ্নটি ও উঠতে পারে যে, ১৬ শতকের পূর্ব থেকেই আরবিস্তান ও পারসিকদের মধ্যে বিরোধ কেন চলে এসেছে। এ প্রশ্নটির জবাব এই যে, কারুন নদী ও শাতিল আরবের উপর সারা এলাকার সমৃদ্ধি নির্ভরশীল বলেই এলাকাটির আধিপত্যের বিষয়ে যুগযুগ ধরে এখানে অশান্তি বজায় রয়েছে।

ইউরোপীয়দের কার্যকলাপ

উপসাগরীয় এলাকায় ইউয়োপীয়দের অনুপ্রবেশ ঘটে অনেক আগে। ইউরোপীয় শক্তিগুলি এই এলাকার রাজনৈতিক অশান্তির সুযোগ নিতেও কসুর করে নাই। পর্তুগীজরা এই এলাকায় আসে ১৬ শতকে। পারস্যের সাথে পর্তুগালের সম্পাদিত এক মৈত্রী-চুক্তি বলেই তারা এই এলাকায় এসেছিল। মৈত্রী-চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল শাহ ইসমাঈলের সময়ে। এই চুক্তি বলেই পর্তুগীজ এবং পারসিকরা মিলিতভাবে আরবদের সাথে বাণিজ্য ও নৌ-যোগাযোগ বয়কট করে। এরপর পর্তুগীজদের প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য এবং পারসিকদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশে তুর্কীরা এই এলাকা দখল করার প্রয়াস পায় এবং বসরা পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আরবিস্তানের অধিকাংশ এলাকা পর্তুগীজ প্রভাবাধীনেই থেকে যায় এবং ১৬৫২ সাল পর্যন্ত এই প্রভাব অক্ষুন্ন

থাকে। এই সময়ে আরবিস্তানে প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে ইংরেজ ও ডাচদের বিরোধ দানা বেঁধে উঠে।

বৃটেন

১৫৮০ থেকে ১৬৬০ সালের মধ্যে ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে স্পেন পর্তুগাল দখল করে নেয়। ফলে আরবিস্তান এলাকায় পর্তুগালের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই বিনষ্ট হয়ে যায় এবং হল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের এই এলাকা দখলের প্রয়াস ছিল মূলতঃ তার ভারতবর্ষে গমনাগমনের পথ নিরাপদ রাখার জন্য। কিন্তু হল্যাণ্ড বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়েই এই এলাকায় আসে। ইংরেজরা বন্দর আব্বাসে তাদের সদর দফতর স্থাপন করে এবং হল্যাণ্ডবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও বসরার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। এই বিরোধিতা ক্রমে শত্রুতায় পরিণত হয় এবং ১৬৫২ সালে উভয় দেশ উপসাগরীয় এলাকায় একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে ইংরেজদের অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বন্দর আব্বাসে তাদের দফতর গুটিয়ে ফেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। কিন্তু এই সময়ে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ইউরোপে হল্যাণ্ডকে চরমভাবে, পরাজিত করলে হল্যাণ্ডের পক্ষে উপসাগরীয় এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করা আর সম্ভব হয় নাই।

ফ্রান্স

১৭৯৯ থেকে ১৮০৯ সালের মধ্যে ফ্রান্স নিজেই উপসাগরীয় এলাকায় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পারস্যের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু ফ্রান্সের পক্ষে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই এই কারণে যে, ভারতে ফরাসী প্রভাব বিস্তৃতির আশংকায় ইংরেজরা এই এলাকায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নেয় এবং পার্শ্ববর্তী

এলাকাগুলিতে নিজেদের কনস্যুলেট স্থাপন করে। তাছাড়া ইতিমধ্যে আরবরাও শাতিল আরব এবং আরবিস্তানে নিজেদের দখল পুনরায় কায়েম করে ফেলে।

ইংরেজদের এই আধিপত্যও বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নাই। কারণ, উপসাগরীয় এলাকায় অচিরেই রাশিয়ার সাথে ইংল্যাণ্ডের বিরোধ শুরু হয়। স্যার পারসী এ প্রসঙ্গে পিটার দি গ্রেটের একটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ঘোষণায় রাশিয়ার সম্রাট পিটার দি গ্রেট স্বীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বলেছিলেন যে, "পারস্য সাম্রাজ্যকে যখনই দুর্বল হতে দেখবে, তখনই তোমরা শাতিল আরবের পথে উপসাগরীয় এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করবে এবং তোমাদের এই প্রচেষ্টা জারী রাখবে যাতে তোমরা ভারতের দিকে এগিয়ে যেতে পার; কারণ এখানেই বিশ্বের সব ধন-রত্নের সন্ধান পাবে"।

রাশিয়া

রাশিয়ানরা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম উপসাগরীয় এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা চালায়। পারসিক সাম্রাজ্যকে তারা হিরাত শহর দখলের প্ররোচনা দান করে। এই হিরাত ছিল ইংরেজদের একটি শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু ১৯০৭ সালের যুদ্ধে জাপানের হাতে পরাজিত হালে রাশিয়া উপসাগরীয় এলাকায় ইংরেজদের সাথে একটি সন্ধি চুক্তি করতে বাধ্য হয় এবং এই চুক্তি বলে আরবিস্তানের উত্তর পর্যন্ত রাশিয়ার প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে। এর ফলে সারা উপসাগরীয় এলাকাটি উত্তরে রাশিয়া এবং দক্ষিণে ইংরেজদের নিকট হইতে বিপদের মুখোমুখি হইয়া পড়ে। তবে উভয় শক্তিই আরবিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কোনরূপ বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করে নাই।

এই সময়ে ইংরেজরা ইরানী এলাকায় ইরানের শাহের নিকট থেকে তেল-সম্পদ অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় গবেষণামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা

বিষয়ে ২০ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে একটি ছাড়পত্র লাভ করে। ইহা ছিল একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। ১৯০২ সালে এই অনুসন্ধানকাজ শুরু হয় এবং ১৯০৮ সালে "বির'সুলেমান" এলাকায় তেলের প্রথম কূপটি সাফল্য-জনকভাবে খনন করা হয়। তেল আবিষ্কারের পর হইতে স্বাভাবিক ভাবেই এলাকাটির প্রতি সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় শক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

জার্মানী

বিশ শতকের প্রথমদিকে পূর্বাঞ্চলের প্রতি জার্মানীরও মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং অচিরেই তারা বসরার সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। পরবর্তী স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা মোহাম্মারা এবং আহওয়াজের সাথেও বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে। এইভাবে উপসাগরীয় এলাকায় তৃতীয় একটি শক্তির আবির্ভাবের ফলে ইংরেজ ও রাশিয়ানদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্বেকার শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, জার্মানীর অনুপ্রবেশের ফলে ইংরেজ ও রাশিয়ানদের মধ্যে অনেকটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, আরবিস্তানের আধুনিক যুগের বিষয়াদি বিশ্লেষণ করার আগে এই এলাকার শাসক বনি কাব গোত্রের কার্যকলাপ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কারণ প্রকৃতপক্ষে বনি কাবের শাসনামলেই আরবিস্তানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগ শুরু হয়।

বনি কাব হল আরবিস্তানে বসতি স্থাপনকারী আরব বেদুঈনদের একটি গোত্র। আল-কালকাশহান্দীর এই গোত্রটি আমর বনি ছা' ছা' নামক একটি আরব গোত্রের অংশ বিশেষ এবং তারা আরব উপকূল থেকে এসে ইরাকী এলাকায় বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলে বসবাস-কারী বনি কাব গোত্রের পূর্বপুরুষেরা সবাই একই গোত্রের লোক ছিল। বনি কাব গোত্রের লোকেরা শাত্তিল আরবের উভয় তীর ধরে বসবাস

করতে থাকে এবং চাষাবাদ ও গৃহপালিত পশু পালনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। তাদের রাজধানীর নাম ছিল কাববান।

ইরানে রেজা খানে ক্ষমতা লাভ ও আরবিস্তান দখল

বনি কাব গোত্রের সর্বশেষ আমীর ছিলেন শেখ খাজ্জাল। শেখ তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর সাথে অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং এভাবে পারসিকদের দূরে সরিয়ে রাখতে প্রথম দিকে অনেকটা সমর্থ হয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই কাজে শেখ ইংরেজদের অনেক সহায়তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সহায়তায় রেজা খান পারস্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর শেখ খাজ্জালের বিপদ বৃদ্ধি পায়। শেখ খাজ্জাল তখন বখতিয়ার গোত্রের ইউছুফ খান, বাসতাকাওয়ার গভর্ণর গোলাম রেজা খান এবং লারিস্তানের আমীর মোজাহেদ খানের সাথে রেজা খানের একটি মৈত্রী জোট গঠন করেন। রেজা খান এতে ক্রুদ্ধ হয়ে আরবিস্তান দখলের উদ্দেশে ইস্পাহান এবং শীরাজের পথে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

শেখ খাজ্জাল এই সময়ে ইংরেজদের সহায়তা কামনা করেন। কিন্তু সাহায্য-সহায়তা দানের সর্বপ্রকার ভান করা সত্বেও ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত কোন প্রকার সামরিক সাহায্য প্রদান করে নাই। এর ফলে রেজা খানের বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় আরবিস্তানের অধিকাংশ শহর, গ্রামাঞ্চল দখল করে নেয়।

মোহাম্মারায় শেখ খাজ্জাল রেজা খানকে স্বীয় প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। রেজা খানকে নিয়ে তিনি রাজ্যের কতিপয় এলাকা সফরও করেন। এরপর জেনারেল জাহিদীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য রেখে রেজা খান পারস্যে ফিরে আসেন।

প্রথম দিকে জেনারেল জাহিদী শেখের সাথে ভাল ব্যবহার করে তাকে তুষ্ট করায় এবং তাকে সফরের উদ্দেশে তেহরানে নিয়ে আসার

অনেক সাধ্য সাধনা করেন। কিন্তু এতে সফল না হয়ে শেষ পর্যন্ত শেখের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করা হয়। শেখ এই সময়ে বসরা নগরীতে ছিলেন। জেনারেল জাহিদী আহওয়াজ থেকে ইরানী সৈন্যদলটি প্রত্যাহার করেন এবং শেখ খাজুলিকে জানান যে, তাকে আরবিস্তান থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব একটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি সসৈন্যে আরবিস্তান ছেড়ে চলে যাবেন। এই উদ্দেশে শেখের প্রাসাদের সম্মুখে শাত্তিল আরবে শেখের নিজের প্রমোদ তরীতে বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয় এবং শেখ ও তার পুত্রকে এই সম্বর্ধনায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান হয়। এতে রাজী হয়ে শেখ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে ইংরেজ রাজপ্রতিনিধিকে পত্র লেখেন। ইংরেজ দূত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করার পর শেখ তদীয় পুত্রকে নিয়ে সম্বর্ধনায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশে প্রমোদ তরীতে উপস্থিত হলে ইরানীরা উভয়কে গ্রেফতার করে প্রথমে মোহাম্মারায় পরে আহওয়াজে এবং সর্বশেষে তেহরানে নিয়ে যায়। এটা ছিল ১৯২৫ সালের ৩০শে এপ্রিলের কথা।

এরপর একদিন তেহরান থেকে প্রচারিত এক ঘোষণায় বলা হয় যে, শেখ খাজ্জাল স্বীয় পুত্র জাসেবের হাতে ক্ষমতা অর্পন করেছেন এবং এর পর থেকে জাসেবের হয়ে ইরান সরকারই আরবিস্তানের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করবে। এভাবেই আরবিস্তান ইরানের অধিকারে চলে আসে এবং রেজাখান শাহ উপাধি গ্রহণ করে শাহ রেজা পাহলবী নামে ইরান ও আরবিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেন।

ইরানী তৎপরতার বিরোধিতা

আরবিস্তান দখল করার পর এই এলাকার প্রতি ইরানীদের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে তাদের বাস্তব কর্মপন্থার মাধ্যমে। এলাকাটিকে ইরানের

অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এবং ইহার আরবীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করার জন্য প্রথমেই তারা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন স্থানের নয়া নামকরণ করতে শুরু করে। এমনকি আরবিস্তানকেও তারা খুজিস্তান নামে অভিহিত করতে থাকে। পরবর্তীতে তারা আরবী ভাষার ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে তদস্থলে ফারসী ভাষা প্রচলনের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ইরানীদের এই প্রচেষ্টা এলাকাবাসীর মনঃপুত হয় নাই। তারা এর বিরোধিতা করে।

নাম পরিবর্তন ও নয়া বসতি স্থাপন

কিন্তু আরবিস্তানের অধিবাসীদের সর্বপ্রকার অসহযোগিতা সত্ত্বেও ইরানী কর্তৃপক্ষ আরবিস্তান এলাকাটিকে ইরানের দশম প্রদেশ হিসাবে গণ্য করতে থাকে। তারা এই এলাকায় একজন সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত করে এবং পূর্বতন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের বিলুপ্তির জন্য বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইরানীদের এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফল প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বার্থহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এলাকাবাসীর মনে ইরানীদের বৈদেশিক সত্তা প্রকট করে তোলে, যার ফলে আরবিস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে ইরানীদের সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় এবং ইরানীদের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে ও তারা স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে।

আরবিস্তানের বিভিন্ন শহর নদ-নদী পাহাড়গুলির নাম পরিবর্তন করা ছাড়াও ইরানীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আরো একটি এমন নীতি অনুসরণ করে যা বিশ্বের সর্বত্র এখনো চরমভাবে নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। এটা হল নয়া বসতি স্থাপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুসারে আরবিস্তানের ৯ হাজার ৮ শত বর্গ মাইল এলাকার আরব গোত্রভুক্ত অধিবাসীকে ইরানের উত্তরাংশে সরিয়ে নিয়ে সেখানে

ইরানী বংশোদ্ভূতদের স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয় এবং এভাবে এই বিরাট এলাকাটি স্থায়ীভাবে ইরানী এলাকায় পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়।

আরবীর স্থলে ফারসী ভাষা

তাছাড়া ইরানের শাহের নির্দেশ অনুসারে আরবিস্তানের বিভিন্ন অফিস-আদালতে আরবী ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং আরবী ভাষায় পরিচালিত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেয়া হয়। আরবিস্তানের অধিবাসীদের আরবের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সফর করার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় এবং কেবলমাত্র হজ্জের সময় ব্যতীত বছরের অন্য কোন সময়ই এই সব দেশ সফর করার জন্য কোন পাসপোর্ট ইস্যু করা হতো না। হজ্জ উপলক্ষে প্রদত্ত পাসপোর্টের মেয়াদ দেয়া হত সর্বাধিক এক মাস এবং তাও বিমানযোগে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হতো।

আরবিস্তানের স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাংশ হওয়া সত্ত্বেও ইরানীরা আরবিস্তানের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে নিতে সমর্থ হয় এবং পুলিশ-সামরিক বাহিনী ও উৎপাদনমূলক কার্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের পক্ষে কৃষিকাজ ও বন্দরের শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

এতসব ভীতি, নির্যাতন ও বিভেদমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইরানী কর্তৃপক্ষের পক্ষে আরবিস্তানেও আরবীয় অধিবাসীদের সম্পূর্ণরূপে দমন করে রাখা সম্ভব হয় নাই। আরবরা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবীতে প্রায়শঃই বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং এই এলাকায় বিগত ৫০ বছরের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইরানীদের সন্ত্রাস ও আরবদের বিদ্রোহের ঘটনায় ভরপুর।

ইরানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

বস্তুতঃ ইরানীরা আরবিস্তান দখল করার তিন মাসের মধ্যেই শেখ খাজালের সৈন্যেরা ইরানী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এটা হল ১৯২৫ সালের ২২শে জুলাই তারিখের ঘটনা। সালেস ও সুলতানের নেতৃত্বে শেখ খাজালের সেনাবাহিনী আল মোহাম্মারাকে স্বাধীন এলাকা বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ইরানী বাহিনী কামানের গোলায় শহরটিকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়ে মোহাম্মারাহ পুনরায় দখল করে নেয় এবং পরাজিত সেনাবাহিনীর বন্দীগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

একই সালে শেখ আবদুল মোহসীন আল-খাকানীর নেতৃত্বে মোহাম্মারায় আরবরা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমন করতে ইরানী কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

এরপর ১৯২৮ সালে মহিউদ্দিন আজ-জীবাকের নেতৃত্বে আল-হাওয়াইজাহ এলাকায় পুনরায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং তিনি একটি সরকার গঠন করে প্রায় ৬ মাস কাল এলাকাটির স্বাধীনতা রক্ষা করেন। এই এলাকায় ইরানীদের সাথে আরবদের প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং এসব যুদ্ধে আরবীয় মহিলারা পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে।

এর পরবর্তী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৯৪০ সালে আল-দাবিস নদী এলাকায়। কা'ব গোত্রের শেখ হায়দার আল-কা'বী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। ইরানী সেনাবাহিনী কর্তৃক শেখ হায়দার বন্দী ও নিহত না হওয়া পর্যন্ত এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয় নাই। ইরানীদের বিরুদ্ধে আল-গাজরিয়া নামক ভয়াবহ বিদ্রোহটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। শেখ খাজ্জালের পুত্র শেখ জাসেব এই বিদ্রোহে পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন গোত্রভুক্ত আরবরা এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ইরানীদের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতেহয়েছিল।

এরপর ১৯৪৫ সালে আরবিস্তান এলাকায় ইরানীদের বিরুদ্ধে পর পর দুটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বনি তরফ গোত্র প্রথমে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ইরানের রেজা শাহ বিদ্রোহ দমনকালে বিশ্ব ইতিহাসের একটি নিষ্ঠুরতম নির্দেশ জারী করে বনি তরফ গোত্রের ১৬ জন গোত্র প্রধানকে জীবন্ত কবর দেয়ার আদেশ দেন, যাতে এই শাস্তিদৃষ্টে ভবিষ্যতে আর কোন বিদ্রোহাত্মক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শেখ মাজখুর আল-কাবের নেতৃত্বে একই বছর আবাদানে আরবরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং ইরানী বাহিনীর ব্যারাকগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে মূল আবাদান শহর আক্রমণ করে বসে। শাহ এই বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন।

এই সময়ে অর্থাৎ, ১৯৪৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আরবিস্তানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আরবলীগ কাউন্সিলে বিরাজিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য একটি আবেদনপত্র পেশ করা হয় কিন্তু আবেদনটি মিসরের ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এই কারণে যে, ইরানের শাহ ছিলেন মিসরের রাজা ফারুকের ভগ্নিপতি। তা ছাড়া ইরাকের রীজেন্ট আবদুল্লাহর সাথেও রেজা শাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ফলে আবেদনপত্রটি প্রকৃতপক্ষে বিবেচনাই করা হয় নাই। তবে এতদসত্ত্বেও ১৯৪৬ সালের ২২শে আগস্ট তারিখে আরব লীগ সমীপে আরবিস্তানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আরো একটি আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছিল।

একই সালে আরবিস্তানের অধিবাসীদের একটি যুব সংঘ গড়ে উঠে। বস্তুতঃ এই সংঘটিই ছিল আরবিস্তানের বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সংঘবদ্ধ যুব শক্তি। এর কিছু দিন পরেই আল-মাদাহ নামে আরো একটি যুব দল একই উদ্দেশে গঠিত হয়।

১৯৫৬ সালে সিরিয়া ও মিসরে আরব জাতীয়তাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে আরবিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে

হয়ে উঠে এবং আরবিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নামক রাজনৈতিক সংগঠনটি গড়ে উঠে। কিন্তু রাজনৈতিক বিক্ষোভ অচিরেই সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ লাভ করে এবং ১৯৫৮ সালে আহওয়াজে গঠিত পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট স্বাধীনতার পথে প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করে দেয়। এই সব সংঘর্ষে ফ্রন্টের ২৭ জন কর্মী নিহত হয়েছিল।

শেষাবধি ১৯৫৯ সালে আরবিস্তানের সব রাজনৈতিক দলগুলি একটি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং এই অধিবেশনে আরবিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় হাই কম্যাণ্ড গঠন করা হয়। এরি মধ্যে আবার ১৯৫৮ সালে ইরাকে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে ইরাকের বিপ্লবী সরকার আরবিস্তানের আরব অধিবাসীদের যথার্থ দাবীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠেন। ফলে আরবিস্তানের আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে উঠে এবং আরবিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের কুয়েত বৈঠকের পর সংস্থাটি ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব আরবিস্তান নামে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করে।

খোমেনীর হঠকারিতা

ইরানের শাহের রাজত্বকালের শেষ দিকে আরবিস্তানের আরব অধিবাসীদের প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশঃ চরম আকার ধারণ করতে থাকে। এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে শাহের পতনের অন্যতম কারণ বলেও আখ্যায়িত করা যায়। আরবিস্তানের অধিবাসীরা সঙ্গতভাবেই আশা করেছিল যে, শাহের রাজত্বের অবসান ঘটলে তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ফিরে পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, আরবিস্তানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে শেখ মোহাম্মদ আল-খাকানী ব্যক্তিগতভাবে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে খোমেনী শেখের সাথে দেখাই করেন নাই।

শেখ মোহাম্মদ আল-খাকানী কেন আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন? শেখ এসেছিলেন আরবিস্তানের অধিবাসী দের পক্ষ থেকে কতিপয় দাবী নিয়ে। দাবীগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১। ইরানে আরবীয়দের পৃথক সত্তার স্বীকৃতি এবং ইরানের শাসন-তন্ত্রে বিষয়টি উল্লেখ করা।

২। আরবিস্তানের জন্য একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন এবং এই ভাবে কিছুটা আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদান। পরিষদকে আরবিস্তানের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে হবে।

৩। আরবীয় নাগরিকদের জন্য পৃথক আরবী কোর্টস স্থাপন করা

৪। আরবী ভাষাকে আরবিস্তানের দ্বিতীয় সরকারী ভাষার মর্যাদা দান করা।

৫। প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলে আরবীভাষার শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করা।

৬। আরব অধিবাসীদের প্রয়োজন মোতাবেক এই এলাকায় একটি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।

৭। আরব অধিবাসীদের চাকুরীর সুযোগ দান করা।

৮। আরবী ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা।

৯। আরবিস্তান এলাকার তেল সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ এই এলাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা।

১০। আরবীয়দের সেনাবাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ বিভাগে নিয়োগের ব্যাপারে কোন প্রকার বৈষম্য না রাখা এবং

১১। এই এলাকার ভূমি বিতরণ সম্পর্কিত আইন সংশোধন করা।

যাহোক, এই দাবির ফলাফল মোটেই ভাল হয় নাই। ইরানীরা এই দাবীর প্রত্যুত্তর দেয় নির্যাতনের মাধ্যমে। আরবিস্তানের ধর্মীয়নেতা শেখ

মোহাম্মদ আল-খাকানীকে তারা গ্রেফতার করে এবং কোম শহরে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর বাড়ীর পাশে বন্দী করে রাখে।

তাছাড়া নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মাদানী আরবীয়দের নিকট থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালান, যার ফলে এখানে সেখানে অনেক সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে ; আর সে সব সংঘর্ষে অন্যূন ৫০০ লোক নিহত হয়, ৩২০ জন আহত হয় এবং ৭০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

আয়াতুল্লাহ খোমেনী এই সময়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আশেপাশের রাষ্ট্রগুলিতে দূত পাঠিয়ে আরবিস্তানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে দেন এবং আরবিস্তানের বিপ্লবীদের অস্ত্র সাহায্য দান বন্ধ রাখার জন্য তাদের অনুরোধ জানান। ইরানের বিপ্লবী আদালতের সভাপতি আয়াতুল্লাহ খালখালী এই সময়ে ইরাক সহ উপ-সাগরীয় অন্যান্য রাজ্যগুলিকে আরবিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে অভিযুক্তও করেন।

১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে আরবিস্তানবাসীর এই সংগ্রাম আরো জোরদার হয়ে উঠে। আরবিস্তানে উগ্রপন্থীরা এই এলাকার ইরানী সামরিক ছাউনী ও তেল প্রতিষ্ঠানগুলিতে আক্রমণ চালায়। এই ঘটনা শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রতি দিনই ঘটতে থাকে এবং আরব মুসলিম জনগণের মোজাহিদ বাহিনীর আন্দোলন, 'আরবিস্তানের জনপ্রিয় আন্দোলন' এবং "আরবিস্তানের আরব জনগণের রাজনৈনিক সংস্থা" নামক তিনটি প্রতিষ্ঠান এই আক্রমণগুলি পরিচালনা করে।

১৯৮০ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে আরবিস্তানবাসী একটি বিপ্লবী গ্রুপ লণ্ডনস্থ ইরানী দূতাবাস আক্রমণ করে দূতাবাসের কর্মচারীদের জিম্মী হিসাবে আটক করে। আরবিস্তানের স্বায়ত্বশাসন প্রদান এবং ইরানীদের হাতে বন্দী আরবিস্তানের অধিবাসীদের মুক্তি আদায় করাই ছিল দূতাবাস কর্মচারীদের আটক করার উদ্দেশ্য। সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী কুতুবজাদেহ তখন কমাণ্ডোদের নেতার সাথে টেলিফোনে আলাপ করে

বলেছিলেন যে, তারা তার সাথে ফারসী ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলেছে এবং তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, কমাণ্ডোদের দাবী কেবল যে উপেক্ষিত হবে তাই নয় বরং ইরানী কর্তৃপক্ষ আরবিস্তানের বন্দীদের হত্যা করবে। এর ছয় দিন পর বৃটিশ নিরাপত্তা বাহিনী দূতাবাস আক্রমণ করে আটক জিম্মীদের মুক্ত করে আনে। তবে এই আক্রমণের সময় কমাণ্ডোরা এবং দুইজন দূতাবাস কর্মচারী নিহত হন।

সাদেক কুতুবজাদেহ এ সময়ে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, ইরানী কর্তৃপক্ষ কোনও এলাকার স্বায়ত্তশাসনের দাবী কোন দিনই স্বীকার করে নেবেনা। তাছাড়া কুতুবজাদেহ তখন এরূপ কথাও বলেন যাতে ১৯৭৫ সালে সম্পাদিত আলজিরীয় চুক্তির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠে।

এতসব বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদমুখরতা সত্ত্বেও ১৯২৫ সাল থেকে আরবিস্তান দখল রাখার সুফল ইরানের জন্য এই হয়েছিল যে, ইরানীরা শাতিল আরবের পানি সীমার একটি অংশে নিজেদের দখল অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। এর পর ১৯৫৮ সালে ইরাকী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ইরানের সাথে ইরাকের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শাহ তখন সুযোগ বুঝে ইরাক ও ইরানের মধ্যে ইতিপূর্বে ১৯৩৭ সালে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে শাতিল আরবের মধ্যবর্তী অংশ পর্যন্ত ইরানের সীমা প্রতিষ্ঠিত করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৭ সালে বৃটেনের মধ্যস্থতায় ইরাক ও ইরানের মধ্যবর্তী শাতিল আরবের ইরানী তীরভূমি পর্যন্ত ইরানের সীমা নির্দেশ করে উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

যা হোক, এই সময় ইরাককে আরও দুর্বল করে দেয়ার জন্য ইরানের শাহ কুর্দীদের সমর্থন করতে শুরু করেন এবং শাতিল আরবের ইরানী তীরের অদূরে আবাদানের তেল শোধনাগার স্থাপন করে উপসাগরীয় দ্বীপগুলিতেও নিজের আধিপত্য দাবী করে বসেন। এটা হল সুয়েজ খালের পূর্বদিকে বৃটিশ আধিপত্য নিঃশেষিত হওয়ার সময়কার কথা।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যা আমরা আগেও একবার উল্লেখ করেছি; সেটা হল যে, ১৯৭১ সালে শাহ উপসাগরীয় আমীরাতের হরমুজ প্রণালীতে অবস্থিত তিনটি দ্বীপ দখল করে নেন। তাঁর যুক্তি তখন এই ছিল যে, গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীকে বিদেশী প্রভাব মুক্ত রাখতে একমাত্র তিনিই সক্ষম। যা হোক, তখন একমাত্র বাগদাদ ছাড়া অপর কোন রাজধানী থেকে শাহের এই কাজের বিরোধিতা করা হয় নাই এবং বাগদাদের এই বিরোধিতাও শাহ তেমন আমল দেন নাই।

ইরাক ও ইরানের মধ্যকার এই উত্তেজনা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেতে থাকে এবং ১৯৭৫ সালের দিকে চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। এই সময়েই আলজিরিয়ায় শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং আলজিরিয়ার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীনের প্রচেষ্টায় আলজিয়ার্সে উভয় দেশের নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইহারই ফলশ্রুতি ছিল ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চের আলজিয়ার্স ঘোষণা এবং তৎপরবর্তী চুক্তি।

আলজিয়ার্স ঘোষণা ও তদনুযায়ী ইরাক ও ইরানের সম্পাদিত চুক্তিতে ইরাক ইরানকে বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছিল।

এই সুবিধা ইরাক বাধ্য হয়েই দিয়েছিল বলে প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে বুঝা যায়। কারণ, ইরাকী সেনাবাহিনীর অবস্থা তখন বিশেষ ভাল ছিল না। ইহুদীদের বিরুদ্ধে সিরীয় পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েই ইরাকী বাহিনী এই অসুবিধায় পড়েছিল।

বস্তুতঃ ইরাকী বাহিনী তখন উহার পূর্ব সীমান্তে অর্থাৎ, ইরানের সম্ভাব্য যুদ্ধাশঙ্কার বিরুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইহুদীরা অভিযান পরিচালনা করলে ইরানকে কিছুটা সুবিধা দিয়ে পূর্ব সীমান্তে শান্তি রক্ষার বিনিময়ে ইরাক ইহুদীদের বিরুদ্ধে সিরীয় সীমান্তে স্বীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। অবশ্য ইরান শেষ পর্যন্ত আলজিয়ার্স

চুক্তির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে নাই। বিষয়টি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক পরবর্তীকালে প্রদত্ত এক ভাষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ভাষণ

ইরাকী জাতীয় পরিষদের সদস্যদের এক বিশেষ অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন—সামগ্রিকভাবে আরব দেশগুলির এবং আমাদের জাতীয় সমস্যাবলী আমাদের নিজস্ব ও আরব জাতির ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। পুরাতন এবং নতুন সকল বিষয় ও সমস্যার ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। অতএব বর্তমানের ঘটনাবলীর মৌলিক দিকগুলি বুঝতে হলে আমাদিগকে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। অতীতে আরব দেশগুলিকে পদানত রেখে এই এলাকার সম্পদ লুণ্ঠনের কাজে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি সর্ব প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে। আরব জাতির বিরুদ্ধে ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে মারাত্মক ষড়যন্ত্রটি করেছে তা হল ইহুদীদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা। অধিকৃত ফিলিস্তিনী এলাকায় তারা এ কাজটি করেছে। এরপর ইহুদীদের এই অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়ে কেবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিই নয়; বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ইহুদী চক্রগুলিও নিজেদের শক্তি নিয়োগ করেছে। এই প্রচেষ্টায় একটি উদ্দেশ্য ছিল ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং অপরটি ছিল আরবদের বিরুদ্ধে ইসরাঈলকে শক্তিশালী করে আরবদের এলাকা দখল করাও তাদের অসহায় করে তোলা। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি কেবল সাম্রাজ্যবাদীদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবেই কাজ করবে না বরং বিশ্বের এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ইসরাঈল তাদের স্বার্থ রক্ষার কাজেও নিয়োজিত থাকবে। ইহুদী রাষ্ট্রটি স্বীয় অস্তিত্বকালে কেবল আরবদের শক্তি বিনষ্টই করে নাই বরং আরবদের অগ্রগতিও ব্যাহত করেছে। তারা যখনই সুযোগ পেয়েছে আরবদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে কখনো দ্বিধা করে নাই।

সাম্রাজ্যবাদ সমর্থনপুষ্ট এই ইহুদীচক্রের প্রথম কাতারের শত্রু হয়েছে ইরাক। এর ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। এর আরও কারণ হলো এই যে, ইরাক সব সময়ই আরব স্বার্থকে বড় করে দেখেছে এবং আরবদের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে ইরাক কোনদিনই পশ্চাদাপসরণ করে নাই।

আধুনিক ইতিহাস লক্ষ্য করলে পরিদৃষ্ট হয় যে, ইরাকের অভ্যন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করার এবং সামগ্রিক আরব ঐক্য থেকে ইরাককে বহিস্কার করার জন্য এই ইহুদী চক্র আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারা ইরাকীদের ধর্মীয় মনোভাব থেকে বিচ্যুত করার কম প্রচেষ্টা চালায় নাই।

১৯৬৮ সালের ১৭ই জুলাই বিপ্লবের আগে ইরাককে প্রায় বিভক্ত করে ফেলা হয়েছিল। যদি এতে তারা সক্ষম হত তাহলে ইরাক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যেত, যেগুলি নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কিছুতেই রক্ষা করতে পারতনা। এভাবেই তারা সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদী চক্রের বিরুদ্ধে ইরাকের প্রচেষ্টা সমূলে ধ্বংস করতে সক্ষম হতো। অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ইরাকী জনগণ জন্মলাভ করেছে এবং বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়কার কথাও একই প্রকার, কিন্তু ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, বিপ্লবের ঐক্য সংহতি প্রতিষ্ঠিত না হলে দুর্বলতা ও বিভক্তির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদীচক্র নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে সহজে অগ্রসর হতে সক্ষম হতো।

বিপ্লবের আগে ইরাকের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র প্রায় কার্যকর হয়ে উঠেছিল এবং বিপ্লবের পরেও বিরুদ্ধ শক্তিকে এই চক্রই প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে।

বস্তুতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইরানই এই বিরুদ্ধ শক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। কিন্তু ইরাকের সম্মান, মাতৃভূমির মর্যাদা ও আরব জাতির মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইরাকের অসীম সাহসী সেনাবাহিনী ইহার যোগ্য জবাব দিয়েছে।

১৯৭৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১২ মাস ধরে যে যুদ্ধ চলেছে সে জনগণ কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নাই। যুদ্ধে নিহতও আহত ইরাকী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার এবং ৬০ হাজার বেসরকারী লোক এই যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছেন।

মার্কিন, ইসরাঈল ও ইরানীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থাকলেও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদের গুরুত্বের বিষয়টিকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলেনা। অনেক সময় এইগুলি রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের ফলাফলকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মার্কিন ও ইহুদীচক্র ইরানীদের হাতে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ তুলে দিয়েছিল। বিষয়টি তখনই নিরতিশয় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যখন মার্কিন ও ইহুদী শক্তির দেয়া সর্বাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইরানী বাহিনী আমাদের সরাসরি আক্রমণ করে বসে। ইরানীরা আমাদের পূর্ব সীমান্তে বিপুল সংখ্যাক সৈন্য মোতায়েন করে আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে। যার ফলে মার্কিন ইহুদীচক্র অপর দিকে নিজেদের ষড়যন্ত্র জোরদার করার সুযোগ পায়। এভাবেই তারা আরব ঐক্যও সংহতি বিনষ্ট করে আরব এলাকা দখলের হীন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়।

প্রশ্নটি এক সময় অতিশয় মারাত্মক হয়ে উঠে যখন সামরিক বাহিনীর রসদ এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রায় ফুরিয়ে আসে এবং বিমান বাহিনীর জন্য শুধুমাত্র তিনটি ভারী শেল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা।

একটি কথা আজ অবশ্য আর অজানা কিছুই নয় যে, অস্ত্র বিক্রয় এখন আর কেবল বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই হয় না। অস্ত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে

এখন সংশিষ্ট দেশের সমর কৌশল এবং রাজনৈতিক নীতির প্রশ্নটিও জড়িত থাকে।

তবে বিগত কতিপয় বছর আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকেই অস্ত্র ক্রয় করেছি। আমাদের আধুনিক ও উন্নতমানের অস্ত্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়া থেকেই এসেছে ; এর অবশ্য একটি বিশেষ কারণ হল এই যে, আমরা তখন আমাদের উত্তরাঞ্চলের ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। আমরা এই কথাগুলি আজ সর্ব সমক্ষেই স্বীকার করছি এবং এগুলি বলতে গিয়ে আমরা কারো উপরই দোষারোপ করতে চাইনা।

একথা সত্য যে, এই কথাগুলি আমরা গোপন রেখেছিলাম বরং রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম এই কারণে যে, অন্যথায় আমাদের সাহসী সেনা বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারত এবং শত্রুরাও তাদের আক্রমণ জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাত। কিন্তু পরিস্থিতি যে ভাবেই গোপন রাখা হোক না কেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে ইরানের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক।

এটা প্রশ্নের একদিক, আর অপর দিকটি হল ইহুদীদের বিরুদ্ধে ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে ইরাকের অংশ গ্রহণের বিষয়। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ইরাক সমর প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় সময় পায় নাই। কিন্তু তথাপি ইরাককে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে প্রধানতঃ আরবজাতির স্বার্থে এবং প্রতিবেশী মিত্র রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্কের কারণে।

উল্লেখ্য যে, ইরাকের পূর্ব সীমান্তে অর্থাৎ, ইরাক-ইরান সীমারেখায় নিয়োজিত ইরাকী বাহিনী ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ায় প্রেরিত হয়েছিল এবং আমরা বিশেষভাবে এটা অবশ্য উল্লেখ করতে পারি যে, ইরাকী বাহিনী ইহুদীদের দামেস্ক বিজয় অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছে।

বাস্তবতার খাতিরে এটাও উল্লেখ করতে হয় যে, এই পরিস্থিতিতে ইরাক শাতিল আরবে ইরানের দাবী কিছুটা মেনে নিয়েছিল। এমতাবস্থায় আলজিরিয়ার মরহুম প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীন যখন ১৯৭৫ সালে শাতিল আরবের ব্যাপারে ইরাক ও ইরানের মধ্যে সরাসরি আলোচনা ও মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন তখন দেশের স্বার্থ, মর্যাদা ও সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার খাতিরে ইরাক সেই প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করে।

ইত্যাকার কারণগুলির জন্যই দলীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব শাতিল আরবে থালওয়েগ লাইনকে ইরাক-ইরানের সীমা হিসাবে মেনে নেয় এবং পরিবর্তে ইরান ইরাকের কতিপয় এলাকা থেকে স্বীয় সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয় যে এলাকাগুলি ১৯১৩ সালের কনস্টান্টিনোপল প্রটোকল লংঘন করে ইরান ইতিপূর্বে দখল করে নিয়েছিল। ইরানের কাজ ছিল ১৯১৪ সালের সীমান্ত কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহেরও বিপরীত। এগুলি ছিল জইন আল-কওস এবং সাইফ-আদ এলাকা। এই ব্যবস্থার আরও একটি শর্ত ছিল যে, অতঃপর ইরান আর আমাদের উত্তরাঞ্চলের ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ রক্ষা করবে না এবং এভাবেই ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

সে সময়ে এই চুক্তির গুরুত্ব ছিল খুবই বেশী। এই চুক্তির বিষয়টি ঘোষণা করার পর পরই ষড়যন্ত্রকারীরা হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের সেনাবাহিনী তখন ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট থেকে ১৫২ হাজার সংখ্যক অস্ত্র হস্তগত করে। অবশ্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত যে দু'সপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছিল সে সময়ে ইরানীরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যায়, কিন্তু এর পরেও এতগুলি অস্ত্র তারা ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এগুলির সবই আমাদের সেনাবাহিনীর অধিকারে আসে।

তখনকার আলজিয়ার্স সিদ্ধান্তকে একটি, সাহসিকতাপূর্ণ বিজ্ঞ দেশপ্রেমমূলক এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে। সাহস কেবল শত্রুর মোকাবিলায় বন্দুক কামান ছোড়ার মধ্যে দেখান যায় না।

জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণকে রক্ষার ব্যাপারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এবং নেতৃত্বের পর্যায়েও দেখান যায়। কেবলমাত্র বন্দুক ও তলোয়ারের মাধ্যমে যখন কোন উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না তখনই কেবল এই কথার সত্যতার প্রমাণ মিলে।

ইরাকের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মান-মর্যাদা এভাবেই এক ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। কেবল ইহাই নয়, এই সিদ্ধান্তের ফলে ইরাক স্বীয় বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়িত করার সুযোগ লাভ করে এবং আরব জাতিগুলিও একটি শক্তিশালী ইরাক তাদের সহায়তকারী হিসাবে লাভ করে। তখনকার বাস্তবতা কঠিন এবং মারাত্মক ধরনের হলেও এই সিদ্ধান্ত বাস্তবতার নিকট নতি স্বীকার ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল সম্পদ ও পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্যমূলক একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়াস।

বস্তুতঃ মার্চের চুক্তিটি ছিল বিরাজিত পরিস্থিতির একটি ফলশ্রুতি। আমাদের জনগণ চুক্তির বিবরাদি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরিস্থিতির আলোকে এই চুক্তিকে একটি বিরাট সাফল্য হিসাবে অভিনন্দিত করেছিলেন। আমাদের সেনাবাহিনীও এই চুক্তিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানান।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সীমানা নির্ধারণ, খুঁটি স্থাপন ইত্যাকার কাজের জন্য উভয় পক্ষের যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে। এসময় বস্তুতঃ আরো তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এগুলি ছিল নদী সীমান্ত, স্থল সীমান্ত ও সীমান্ত নিরাপত্তা সম্পর্কিত।

প্রথমদিকে শাতিল আরবের সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে ইরানী পক্ষ অনেকটা সুবিধা করে নেয়। পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হল স্থল সীমান্ত। স্থল সীমান্তের ব্যাপারে অনেক সময় অযথা ব্যয় হয়ে যায়। কারণ, ১৯৭৯ ও ৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইরানে বিরাজিত পরিস্থিতির কারণে তাদের পক্ষে আমাদের প্রাপ্য এলাকা হস্তান্তর করার

কাজে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। যাহোক, ইরানে যখন নয়া নেতৃত্ব ক্ষমতা লাভ করে, তখনো এসব এলাকা হস্তান্তরের কাজ সমাপ্ত হয় নাই অর্থাৎ এলাকাগুলো তখনো তাদের আধিপত্যেই রয়ে গিয়েছিল। আমরা তখন উপলব্ধি করেছিলাম যে, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কাজ করতে নয়া নেতৃত্বের কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু ইরানে বর্তমান শাসকদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই আমরা তাদের নির্যাতনমূলক ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বিনষ্ট করার মনোভাব লক্ষ্য করে আসছি। পরবর্তীতে মার্চ চুক্তির প্রতি নিজেদের আনুগত্যের বিষয়টিও তারা অস্বীকার করতে থাকে। প্রথম দিকেই ইরানী শাসকরা চুক্তির যে বিষয়টি ভঙ্গ করে, তাহল ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃবর্গকে ইরানে আশ্রয় গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো। ইরানী শাসকদের আমন্ত্রণে মার্কিনী পুতুল বারাজানী ও তার সঙ্গী-সাথীরা আমেরিকা থেকে ইরানে আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে; কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়! কারণ বারাজানী মার্কিন দেশেই মৃত্যুবরণ করেন। বারাজানীর সঙ্গী-সাথী ও তার ছেলেরা এসে ইরাকের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার কম কোশেশ করে নাই।

কিন্তু ইরানী শাসকচক্রের এহেন মনোভাব সত্বেও ইরাকের পক্ষ থেকে এই চুক্তি সর্বতোভাবে মেনে চলা হয়েছে এবং কেউ যেন এই চুক্তি ভঙ্গ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

চুক্তিটি যখন সম্পাদন করা হয় তখন ইরাকের পক্ষে পরিস্থিতি সুবিধাজনক না হওয়া সত্বেও এরূপে চুক্তিটির কাঠামো তৈরী হয়েছিল যাতে এর যে কোন শর্ত ভঙ্গ করা সম্পূর্ণ চুক্তিটিকে অস্বীকার করার সামিল হয়ে দাঁড়ায় এবং যেহেতু ইরানী পক্ষ প্রথম থেকে চুক্তিটি ভঙ্গ করে ইরাকের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, ইরাকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-

কারীদের অর্থ, রসদ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে এবং মার্কিন ঘেষা ইহুদীদের সাথে এক যোগে কাজ করছে সেহেতু আপনাদের সামনে আমিও আজ ঘোষণা করছি যে ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি আমরাও আজ থেকে মেনে চলবো না।

অতএব শাতিল আরবের বিষয়ে আমাদের আইনগত অধিকার অতঃপর ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চের পূর্বেকার অবস্থায় উপনীত হল। এখন থেকে এই নদীতে ইরাকী আরবদের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে যা হবে সার্বভৌম অধিকার থেকে উৎসারিত। ইরাক সারা বিশ্বের সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সব সময় রক্ষা করেছে এবং সে কিছুতেই ভয়-ভীতির কারণে স্বীয় সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে দিবেনা। যত অধিক ত্যাগ স্বীকার করতেই হউক না কেন ইরাকের সেনাবাহিনী ও জনগণ যে কোন মূল্যে স্বদেশের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে।

আমাদের পানি ও স্থল সীমায় নিজেদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আজ আমরা গ্রহণ করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অঙ্গীকারও করছি যে, শক্তি ও যোগ্যতার মাধ্যমেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে এবং আমাদের এই আইনানুগ অধিকারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত।

আপনাদের সামনে আগেকার মত আমরা আবারও বলছি যে, প্রতিবেশীর সাথে এমনকি ইরানের সাথেও আমরা উত্তম সম্পর্ক কামনা করি। ইরাক ইরানের এক ইঞ্চি ভূমিও দখল করতে চায় না। ইরাক যুদ্ধ শুরু করতে মোটেই আগ্রহী নয় এবং আমরা আমাদের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার বাইরে বিরোধের এলাকা সম্প্রসারিত করতেও আগ্রহী নই।

ইরানের দম্ভ ও অহংকারে অন্ধদের প্রতি এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী, ইহুদীবাদী ও সুযোগসন্ধানী সহায়তাকারীদের প্রতি আমরা আহ্বান জানাই, জঈন আল-কওস এবং সাইফ সা'দের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা

গ্রহণ করার। সাহসী ও বিশ্বাসীদের এটাই হল যোগ্য কাজ। আমরা তাদের প্রতি ন্যায় ও যুক্তির আহবানে সারা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাই। আমরা তাদের প্রতি আহবান জানাই, ইরাক ও আরব দেশগুলির সাথে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য। ইরাক ও আরবদের নিকট থেকে দখল করে নেওয়া প্রতি ইঞ্চি ভূমি ফেরত দেওয়ার জন্য। এভাবে ইরানী শাসকরা ইরানের জনগণের জন্য মঙ্গল আনয়ন করতে পারেন, আরব বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদী শক্তির অনিষ্ট সাধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাদের সহায়তাকারী হিসাবে পরিগণিত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন।

আমরা আপনাদের কাছে আরব জাতিগুলির নিকট এবং সারা বিশ্বের সমীপে ঘোষণা করছি যে, আমরা ইরানী শাসকচক্রের মুখোশ খুলে দিয়েছি। এই চক্রান্তকারীরা আরবদের সার্বভৌমত্ব ও বৃহত্তম স্বার্থের বিনিময়ে সম্প্রসারণবাদের স্বার্থে ধর্মকে ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করেছে, তারা সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ।

এই লোকগুলির ধর্মের মুখোশ শুধুমাত্র ইরানী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তারা যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংশয় ছড়াচ্ছে তা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ইহুদীদের কাজে লেগেছে মাত্র।

এরূপ অনেকে রয়েছেন যাদের মনে প্রকৃতপক্ষে কি আছে সে বিষয়ে আমরা পরে উল্লেখ করব। তারা বলে থাকেন—খোমেনী ও শাহের মধ্যে তফাত রয়েছে। আমরা তার সঙ্গে শাহের মত ব্যবহার করছি কেন? এদের কাছে আমাদের উত্তর হল: আমরাও আন্তরিকভাবে তাই আশা করেছিলাম, খোমেনী শাহের চেয়ে ভিন্ন ধরনের হবেন। অন্ততঃ আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও আরব এলাকার প্রেক্ষিতে। শাহের চেয়ে তিনি যে প্রকৃতই ভিন্ন ধরনের তা প্রমাণ করার জন্য আমরা যথেষ্ট সময়ও দিয়েছি। কিন্তু তিনি ও ইরানের অন্যান্য শাসকবর্গ এটা

ভালভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, সম্প্রসারণবাদ অনুসরণের ক্ষেত্রে, আরবদের স্বার্থ বিনষ্ট করার বিষয়ে শাহের সাথে তাদের কোন প্রার্থক্য নাই। শাহ যেসব এলাকা জবর দখল করেছিল তারা সেগুলি কুক্ষিগত করে রেখেছে, গ্রেটার তামব, লেসার তামব ও আবু মুসা আরব দ্বীপ গুলি তাদের অধিকারে। তাছাড়া আরবদের চাপের নিকট নতি স্বীকার করে শাহ যেসব আরব এলাকার উপর স্বীয় দাবী প্রত্যাহার করেছিল তারা সেগুলিও দাবী করেছে। আর ইরাকের কথা বলতে গেলে, ১৯৭৫ সালের চুক্তিবলে শাহ ইরাকের যেসব এলাকা প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হয়েছিল, তারা সেগুলো ফেরত দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

ইরানী শাসকদের বর্ণবাদের কথা, তাদের নির্যাতনমূলক কার্যাবলীর কথা যখন আমরা দুঃখের সাথে উল্লেখ করি, তখন আমরা ইরানী জনসাধারণের কথাও বিস্মৃত হই না। তারা বর্তমানে যে অসহনীয় পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন, তা থেকে তারা মুক্ত হোন, আমরা তাই কামনা করি। আমরা ইরানবাসীর সাথে বন্ধু হিসাবে বসবাস করতে চাই।

আহওয়াজের আরববাসীরা আজ শাহের আমলের চেয়েও বিষাদময় পরিবেশে দিন কাটাচ্ছে তাদের জন্য আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রয়েছে। বীর কুর্দীদের প্রতি এবং ইরানের জনসাধারণের প্রতিও আমরা অভিনন্দন জানাই। আমরা বলতে চাই যে, ইরানের এক ইঞ্চি ভূমি দখল করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা ইরানবাসীর মিত্র, বন্ধু।

প্রতিবেশী দেশ ইরানকে আমরা একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চাই। আমরা চাই, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে, মুক্তি, স্বাধীনতা ও কল্যাণের লক্ষ্যে ইরান স্বীয় অবদান কায়েম করুক। সারা বিশ্বকে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চের পূর্বে ইরাক শাতিল আরবে নৌচলাচল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে এবং এখন এই কাজে ইরাকের দক্ষতা আরো বেড়েছে। আমরা আশা করি, ইরানসহ সং-

শ্লিষ্ট সকলে শাতিল আরবে ইরাকের সার্বভৌমত্ব মেনে নিবেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দলীয় এক সভায় জনৈক বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন— নয়া ইরান সরকারের শত্রুতার মোকাবিলায় আমাদের শক্তি কতটুকু সংহত? জবাবে আমি বলেছিলাম যে, নেতৃত্বের কাজে অভ্যস্ত ইরাকের শক্তি সব সময়ই অন্ততঃ এতটুকু সংহত থাকে যাতে ঐতিহাসিক প্রয়োজন মুহূর্তে সমস্যার মোকাবেলা করা যায়। কিন্তু আপনাদের বলছি এবং ন্যায়-বাদী সবগুলি আরব রাষ্ট্রের সমীপে পেশ করছি যে, সংহত অথবা অন্য যাই কিছু হোক না কেন ইরানী পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে, ইহুদী-দের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে শক্তি লড়াই করবে তা হলো ইরাকের মহান জনগণ। আমাদের জনসাধারণের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের মনোভাব আমাদের ঐতিহ্য, ইসলামের মহান আদর্শ এবং আরব ও ইরাকী জাতির গৌরব থেকে উৎসারিত।

আমাদের এই আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতিক হল অসম সাহসী সেনাবাহিনী। মহান আরব ও ইরাকী জাতির উজ্জল ইতিহাস ও বিপ্লবের মৌল নীতিতে এই সেনাবাহিনী দৃঢ় প্রত্যয়শীল ও অজেয়।

কনষ্টান্টিনোপল প্রটোকল

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ভাষণে ১৯১৩ সালের কনষ্টান্টি নোপল প্রটোকলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ভাষণে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, দেশের স্বার্থ, মর্যাদা ও সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার খাতিরে ইরাক আলজেরীয় প্রেসিডেন্টর মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতি-তেই ইরাকের দলীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব পরবর্তীতে শাতিল আরবে থালওয়েগ লাইনকে ইরাক-ইরানের সীমা হিসাবে মেনে নেয় এবং তার পরিবর্তে ইরান-ইরাকের কতিপয় এলাকা থেকে সেনাবাহিনী

সরিয়ে নেয়, যে এলাকাগুলি ১৯১৩ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল প্রটোকল লংঘন করে ইরান ইতিপূর্বে দখল করে নিয়েছিল। অতএব বর্তমান বিরোধের পূর্ববর্তী শান্তিল আরব এলাকার রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হলে ১৯১৩ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল প্রটোকলের বিষয়াদি আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রটোকলটি আসলে তুরস্ক ও পারস্যের সীমানা সংক্রান্ত। প্রটোকলটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯১৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর। প্রটোকলটিতে প্রদত্ত বর্ণনা হল নিম্নরূপ :

পারস্য ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের মধ্যে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত মতৈক্যসমূহ রেকর্ড করার জন্য মহামান্য সুলতানের দরবারে প্রেরিত বৃটেনের বিশেষ দূত মাননীয় স্যার লুই মলেট, মহামান্য সুলতানের দরবারে প্রেরিত পারস্যের শাহানশাহের রাষ্ট্রদূত মাননীয় মীর্জা মাহমুদ খান খাজর, মহামান্য সুলতানের দরবারে প্রেরিত রুশ সম্রাটের দূত মাননীয় এম, মাইকেল ডি, জিয়াস এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় উজির প্রিন্স সাঈদ হালিম পাশা মিলিত হন। তারা এযাবৎ নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে যত মতৈক্য হয়েছে সেগুলি স্মরণ করে কাজ শুরু করেন।

তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে ইতিপূর্বে তেহরানে স্বাক্ষরিত প্রটোকলের ১ নং ধারা অনুসারে গঠিত সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত যুক্ত কমিশন ১৮টি সভায় মিলিত হন। প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১২ই মার্চ এবং শেষ বৈঠক বসে ৯ই আগষ্ট তারিখে। এটা ১৯১২ সালের ঘটনা।

১৯১২ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখে কনষ্টাণ্টিনোপলে অবস্থিত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত তুরস্কের মহামান্য সুলতানের নিকট প্রেরিত ২৬৪নং পত্রে উল্লেখ করেন যে, ইরজে রোমের চুক্তি, যা প্রকৃতপক্ষে ১৮৪৮ সালের স্থিতাবস্থার নামান্তর, দ্রুত কার্যকর করার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ

করা বর্তমানে সঠিক হবে না বলে রুশ সম্রাট ধারণা পোষণ করেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রদূত সুলতানের নিকট একটি স্মারক চিত্রও পাঠিয়ে ছিলেন, যাতে বর্তমানে বলবত চুক্তিসমূহের ভিত্তিতে বিস্তারিতভাবে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া ছিল।

তুরস্কের সুলতানের পক্ষ থেকে ১৯১৩ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে প্রদত্ত ৩০৪৬৯/৪৭ নং পত্রে এর জবাব দেয়া হয়। জবাবে বলা হয় যে, মহামান্য সুলতান রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এবং উভয় দেশের মধ্যে কোনও প্রকার মতদ্বৈধতা থাকলে তা নিরসনের জন্য ও পারস্য সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা প্রদর্শন এবং তুরস্ক ও পারস্যের সাথে সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা দূরীকরণের জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের দেওয়া সীমানা চিহ্নিত স্মারকলিপি গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন যা সরদার 'বুলাক' থেকে'বেন' অর্থাৎ, ৩৬ অক্ষাংশের সমান্তরালে তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে সীমানা নির্দিষ্ট করবে।

এই জবাবে অবশ্য রাশিয়ার রাষ্টদূতের দেয়া স্মারকলিপির বিষয়ে কতিপয় সংশোধনীরও প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। তাছাড়া এই জবাবে জোহাব সীমান্তের বিষয়ে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পারস্যের সাথে সীমানার বিষয়ে তুরস্কের গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়।

১৯১৩ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রদত্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের ৭৮ নং পত্রে এ বিষয়ে লেখা হয় যে, এটা এখন বুঝা যায় যে, ৯ই আগষ্ট তারিখের পত্রের মর্মানুযায়ী সুলতানের নিকট থেকে প্রাপ্ত জবাব ১৮৪৮ সালের চুক্তির ৩নং ধারা মোতাবেক আরাত বেন এলাকার সীমা নির্ধারণের বিষয়ে সম্মতিসূচক। তাছাড়া এই পত্রে সোপারিশকৃত সীমানা চিহ্নের বিষয়েও তুরস্কের চুক্তি যথেষ্ট নয়, বলে মন্তব্য করা হয়।

১৯১৩ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে বৃটিশ ও রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতগণ যুক্তভাবে একই কথা মহামান্য সুলতানের নিকট লিখে পাঠান।

এই পত্রটি প্রেরিত হয়েছিল মাননীয় প্রিন্স সাঈদ হালিম পাশার নিকট। এই সব চিঠি-পত্রের ভিত্তিতে এক পক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রদূত এম, ডি, জিয়াস ও স্যার জিরর্ড লুথার ও অন্যপক্ষে মাননীয় মাহমুদ শেফকাত পাশার মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের ফলাফল আবার স্মরণিকার আকারে বৃটিশ ও রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের নিকটও দেয়া হয়েছিল। পারস্য ও তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্ত নির্ধারণের বিষয়ে এর পরপরই অর্থাৎ, ২৯শে জুলাই তারিখে স্যার এডওয়ার্ড গ্রে এবং ইবরাহীম হাক্কী পাশার মধ্যে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আলোচনার ভিত্তিতে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় এবং এসবের ভিত্তিতে অতঃপর রুশ রাষ্ট্রদূত তুরস্ক ও পারস্যের সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে কতিপয় মৌলিক নীতি প্রণয়ন করেন। ৫ই আগষ্টের ১৬৬ নং নোটে রাষ্ট্রদূত কর্তৃক এই নীতিমালা সুলতানকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সুলতান ২৩শে সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত স্বীয় জবাবে এগুলি স্বীকার করে নেন।

এর ফলস্বরূপ বৃটেন, পারস্য, রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে আরো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সরকারী প্রতিনিধিবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদিতে সম্মত হন :

তুরস্ক ও পারস্যে সীমানার সংজ্ঞা নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরারাতের মধ্যবর্তী সরদার বুলাকের সন্নিকটে অবস্থিত তুরস্ক ও রাশিয়ার সীমান্তে ৩৭নং সীমান্তচিহ্ন থেকে উত্তর সীমানা নির্ধারণের কাজ শুরু হবে। পর্বতমালার কাছে গিয়ে এটা কিছুটা দক্ষিণের দিকে সরে যাবে যাতে দামবাত, সারওয়াক এবং ইয়ারাইম কায়ার পানি প্রবাহের ব্যবস্থাবলী পারস্যের অংশে পড়ে। এরপর পারস্যের বুলাক-বাসী থেকে সুউচ্চ পর্বতমালার দিকে সীমানা অগ্রসর হবে যা ৪৪ ডিঃ ২২ শতাংশ দ্রাঘিমাংশে ও ৩৯ ডিঃ ২৮ শতাংশ অক্ষাংশে পড়ে। ইয়ারাইম কায়ার পশ্চিমাংশের জলাভূমির পশ্চিম এলাকা দিয়ে অতঃপর সারি-মু নদী অতিক্রম করে সীমানা

গীর্দে বারাম এবং বহিজারগাম গ্রাম দুটির মাঝ দিয়ে সারানলী, জেন্দুলী গির-কেলাইম, কামলী বাবা, গিদুকী, খমিনেদ ও দেবজী পর্বত-মালার জলাভূমি অতিক্রম করবে। দেবজী পর্বতমালা থেকে চলতি পরিস্থিতি অনুসারে সীমানা নির্ধারণ কমিশন নাদো এবং নিকতো গ্রাম দুটি পারস্যকে দিয়ে সীমানা নির্ধারণের কাজ চালিয়ে যাবে।

কাইজাইলকায়া গ্রামটির মালিকানা তার ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করবে। তবে এর জলাভূমির পশ্চিমাংশ তুরস্ককে এবং পূর্বাংশ পারস্যকে দেয়া হলো।

সীমানা যদি তুরস্কের এলাকা ছেড়ে কাইজাইলকায়ার সমীপবর্তী রাস্তা ধরে বাইজাইদকে ভেন প্রদেশের সাথে যুক্ত করে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, পারস্য সরকার এই সব পথে সেনা চলাচল ব্যতীত অন্যান্য কাজে তুরস্কের চলাফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। সীমানা এর পর আরবিস্তানের জলাভূমির দিকে চলে যাবে।

কনষ্টান্টিনোপল প্রটোকলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, মান্দালী ও উত্তরাংশের পয়েন্টের সীমান্ত লাইন সম্পর্কে মাননীয় হাক্কী পাশা ও স্যার গ্রের মধ্যে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে আলোচনার ভিত্তিতে সীমানা কমিশন স্বীয় কর্তব্য সমাধা করবে।

প্রটোকলে উল্লেখ করা হয় যে, সমুদ্র এলাকা পর্যন্ত হাওয়াইজাহ অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের কাজটি উম-শির থেকে শুরু করা হবে যা বাসেত্তিন থেকে নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। উম-শির থেকে সীমানা ৪৫ ডিঃ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে যাবে। এই পয়েন্ট থেকে সীমানা দক্ষিণ দিকে চলে গিয়ে ৩১ ডিঃ অক্ষাংশে পৌঁছবে এবং অতঃপর তা কুশক-এ-বসরাতে গিয়ে মিলিত হবে এবং তা এরূপে হবে যাতে কুশক-এ-বসরা তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশে পড়ে। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে সীমানা খায়ইন ক্যানেল ধরে নহরে

জাহলেহ-এর মুখ পর্যন্ত শাতিল আরবে গিয়ে মিলিত হবে। এরপর সমুদ্র পর্যন্ত সীমানা শাতিল আরব ধরে এগিয়ে যাবে। তবে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে শাতিল আরব ও তার সবগুলি দ্বীপে তুর্কী সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে।

(১) পারস্যের অন্তর্গত থাকবে: (ক) মুহাল্লা এবং শাতিল আরবের বাম তীরবর্তী দুটি দ্বীপ। (খ) শেতাইত ও মাবিয়ার মধ্যবর্তী চারিটি দ্বীপ এবং মানকুহীর বিপরিত দিকস্থ দুটি দ্বীপ। (গ) আবাদানের সন্নিকটে অবস্থিত অথবা ভবিষ্যতে গড়ে উঠতে পারে এরূপ যে কোন ক্ষুদ্র দ্বীপ।

(২) মোহাম্মারার আধুনিক বন্দর ও নোঙ্গর এলাকা পারস্য সাম্রাজ্যে অন্তর্গত থাকবে। কিন্তু এর ফলে তুর্কীদের এই এলাকা ব্যবহারের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না।

(৩) পারস্যের এলাকাভুক্ত শাতিল আরবের তীরে মাছ ধরার ব্যাপারে বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম-রীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

(৪) জোয়ারের ফলে পারস্যের কোন এলাকা পানির আওতায় এসে গেলে তুর্কীরা সে অংশ দাবী করতে পারবে না।

(৫) মোহাম্মারার শেখ তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত স্বীয় এলাকার উপর স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখতে পারবেন।

এভাবে যে সীমানা নির্ধারণ করা হলো তদ্ব্যতীত অপর কোন এলাকার সীমা নির্ধারণের প্রশ্ন অবশিষ্ট রয়ে গেলে সে এলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে।

সংশ্লিষ্ট চারটি সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সীমানা চিহ্নিতকারী কমিশন সরেজমিনে সীমানা চিহ্নিত করার কাজ সমাধা করবেন। প্রতিটি সরকারের পক্ষ থেকে এই কমিশনে একজন কমিশনার ও একজন সহকারী কমিশনার কাজ করবেন। প্রয়োজনবোধে সহকারী কমিশনার কমিশনারের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

এভাবে সীমানা চিহ্নিত করার কাজে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য দেখা দিলে তুরস্ক ও পারস্যের কমিশনারদ্বয় পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের মতামত লিপিবদ্ধ করে বৃটিশ ও সোভিয়েট কমিশনারদের নিকট পেশ করবেন এবং পরবর্তী কমিশনারগণ এই বিষয়ে গোপন আলোচনার পর পূর্ববর্তী কমিশনারগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন এবং এই সিদ্ধান্ত অতঃপর সংশ্লিষ্ট চারিটি সরকারের জন্যই বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচিত হবে।

এভাবে একবার কোন এলাকার সীমানা চিহ্নিত হওয়ার পর বিষয়টি দ্বিতীয় দফা বিবেচিত হবে না। তাছাড়া তুর্কী ও পারস্য সরকার ইচ্ছা করলে চিহ্নিত সীমানায় পোষ্ট গেড়ে দিতে পারবেন।

স্বাক্ষর : লুই মলেট, এহতেশামুসসুলতানেহ মাহমুদ, মাইকেল ডি জিয়াস, সাঈদ হালিম।

কনষ্টাণ্টিনোপল প্রটোকলের উপরোক্ত বিবরণ থেকেও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, ইরানের শাহ পরবর্তীকালে অর্থাৎ, ইংরেজদের এ এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বসবাসরত আরবদের সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগে শাতিল আরবের যে সব এলাকা স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন, সেগুলি সম্পূর্ণ রূপেই পরিপন্থী ছিল। অথচ এ প্রটোকল অনুসারে দখলকৃত এলাকাগুলোতে ইরাকের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি অস্বীকার করার পক্ষে কোন যুক্তি উত্থাপন করা যায় না।

কুর্দীদের কথা

এর পরবর্তীতে আসে কুর্দীদের কথা, যা প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন উপরোক্ত ভাষণে উল্লেখ করেছেন।

কুর্দীদের প্রসঙ্গটিও যথেষ্ট পুরাতন এবং জটিল। বস্তুতঃ ইরাক ও ইরানের বর্তমান সম্পর্কের প্রশ্নে কুর্দীদের প্রসঙ্গের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এ প্রশ্নটি প্রথম বড় হয়ে দেখা দেয় ইরাকী নেতা আবদুল করিম কাসেমের সময়ে।

বস্তুতঃ ১৯৬১ সালের দিকে কুর্দীরা নিজেদের উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে এবং পরবর্তী বিভিন্ন শাসনামলে বিষয়টি নিয়ে দেনদরবার করতে থাকে। বিশেষ করে, বারজানী গোত্রের নেতা মোল্লা মোস্তফা আল-বারজানীর সাথে আবদুল করিম কাসেমের মতভেদ কোনরূপ সমঝোতা সৃষ্টির সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিলে কুর্দী আন্দোলন সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ লাভ করে এবং সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও মাঝে মধ্যেই উভয় পক্ষে ছোটখাট লড়াই চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে ১৯৬৮ সালে বাথ পার্টি ইরাকের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের বিষয়কে ভিত্তি করে একটি সমাধানে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। বাথ পার্টি এবং কুর্দী নেতৃবৃন্দের এই আলোচনার ফলশ্রুতি হল ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চের ঘোষণা, যে ঘোষণায় ইরাক সরকার কুর্দীদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী নীতিগতভাবে মেনে নেন।

এই সমঝোতার ভিত্তিতেই বাথ পার্টি, কুম্যনিষ্ট পার্টি এবং কুর্দীদের স্বতন্ত্র ও প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনের নীতি ও আইন প্রণয়নের জন্য বহু দফা আলোচনা বৈঠকে বসেন এবং একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করেন যা ব্যাপকভাবে সারা ইরাকে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়। এরপর ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চে এই বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই বহু আলোচিত চূড়ান্ত ঘোষণাটিও বারজানী গোত্রের নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইরাক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

বারজানী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে কুর্দিস্তানের পাঁচ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। এর অনেক পরে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুর্দীদের বিদ্রোহের বিষয়টিতে বিদেশীদের হাত ছিল। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের ইনটেলিজেন্স

কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ইরাককে হীনবল করার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্র কুর্দী বিদ্রোহীদের শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। যাহোক, ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে শেষ পর্যন্ত স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠিত হয় এবং ১৯৭৪ সালের ৫ই অক্টোবর এই কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক বসে। কাউন্সিলরগণ স্বায়ত্ব-শাসিত এলাকার একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

অতএব এটা পরিষ্কার যে, ১১ই মার্চের ঘোষণা কুর্দী সমস্যার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সম্পর্কে ঘটনার চার বৎসর পর প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন নিজেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিশ্লেষণ

১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ তারিখে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন যে, ১৯৭০ সালের দিকে রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্রোতধারা ও বিরুদ্ধবাদী উত্তরাধিকারের লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিল। একই ধারার অস্তিত্ব ছিল বাথ আরব সোশালিষ্ট পার্টি এবং কুর্দিশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যেও। তদানীন্তন প্রধান রাজনৈনিক দল বাথ আরব সোশালিষ্ট পার্টির পক্ষে তখনও সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় নেতৃত্বদানের যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল না। সেনাবাহিনীর পরিচালকদের মধ্যে এরূপ অনেক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল যারা ১৯৭৩ সালের ১১ই মার্চের ঘোষণার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বস্তুতঃ বিষয়টিকে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্বের বিরোধী বলেই ধরে নিয়েছিলেন। অতএব এই ঘোষণার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাথ পার্টিকে নিজেদের সমাজের মধ্যেই একটি সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

এরও আগে কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে যোগাযোগ করা হলে সশস্ত্র সংগ্রামের অবসানের লক্ষ্যে দলীয় প্রতিনিধিগণ কতিপয় সোপারেশ পেশ করেন। তাদের সোপারেশের মূল কথা ছিল যে, কুর্দী

যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা অবিলম্বে তুলে নিতে হবে। প্রতিনিধিদের পক্ষে সোপারেশগুলি পেশ করেছিলেন জনাব দারা তৌফিক। তাকে তখন এটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, এই ইস্যুর উপর ভিত্তি করে কুর্দী যোদ্ধারা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নাই। তাছাড়া জনাব আজিজ শরীফ যখন প্রথম বার উত্তরাঞ্চল সফরে গিয়েছিলেন, তখনও তাঁর সাথে একই ধরনের কথা হয়েছিল। এই আলাপ-আলোচনার মূল বিষয়াদি ১১ই মার্চের ঘোষণায়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তা সম্ভব হয়েছিল মুক্ত মন ও শুভেচ্ছামূলক মনোভাবের কারণেই।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন যে, ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চের পরবর্তী চারটি বছরে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা ছিল যথেষ্ট কণ্টক উত্তীর্ণ। বিশেষ করে কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা অনেক শ্রমসাধ্য হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের অনেক অংশেই এই সময় আইন ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। আমার যতদূর মনে হয়, বিষয়টি ইরাকের কারো অজানা নাই। অতএব এটা বলা হয়ত বা অসত্য হবে না যে, ১১ই মার্চের ঘোষণা সব বিরোধিতার সমাপ্তি ঘটিয়েছে।

কিন্তু তথাপি একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক বছর আগে এ সম্পর্কে জাতীয় পরিষদে আমাদের জনৈক সদস্য দুটি প্রশ্ন রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ১১ই মার্চের ঘোষণার কোন প্রয়োজন আছে কি? তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল ইরাকী ঐক্য প্রসঙ্গে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার সুযোগ কতটুকু রয়েছে? তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তখন বলা হয়েছিল যে, বস্তুতঃ কুর্দীদের মনোভাব তথা স্বায়ত্ব-শাসনের বিষয়টি প্রাসঙ্গিকতার আলোকে বিবেচনা করার জন্যই পরিষদে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই একই মনোভাব কার্যকর হয়েছে স্বায়ত্তশাসন ঘটিত খসড়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও। আরব বাথ সোশ্যালিষ্ট পার্টির আঞ্চলিক কম্যাণ্ড এ বিষয়ে যে কাগজ-পত্রাদি তৈরি করেছিলেন সেগুলির ভিত্তিতেই এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ আজকের অর্থাৎ, ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চের আইনকে আমরা দেখতে পাই। এই আইন প্রণয়ন করাকালে সব দল ও মতের লোককে নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এটা এজন্য করা হয়েছে যে, দলমত নির্বিশেষে সব দেশপ্রেমিক ইরাকীর মতামতকে আমরা শ্রদ্ধা করি। এ বিষয়ে কুর্দিশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে আলোচনাকালে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চের পর আজ পর্যন্ত অনেক সময় গড়িয়ে গেছে এবং এতে সত্যতাও রয়েছে।

কিন্তু বিবর্তন কি প্রকৃত দায়িত্ব থেকে কাউকে অব্যাহতি দেয়? আমরা বিবর্তনে বিশ্বাস করি, তবে সে বিবর্তন হবে গতিশীল এবং আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, সময়ের পরিবর্তনে প্রকৃত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, বিশেষ করে তার সাথে যখন নিজেদের জনগণের ভবিষ্যৎ জড়িত থাকে।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কুর্দিশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যদের নিকট আমরা কি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করতে পারি যে, ইরাকের কোন ব্যক্তির ১১ই মার্চের ঘোষণা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার রয়েছে কি না?

এর অর্থ এ নয় যে, আমরা এই ধরনের কিছুকে উৎসাহিত করতে চাই। তবে আমরা একথাও বলতে চাই যে, ইরাকের জনগণই স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত খসড়া আইন অনুমোদন করেছে। ১১ই মার্চের ঘোষণার পর জনগণের মধ্যে যে আনন্দ-উল্লাস দেখা গিয়েছিল তা জনগণ

কর্তৃক ১১ই মার্চের ঘোষণাটি অনুমোদন করারও প্রমাণ। তাছাড়া আমরা একথাও বলতে চাই যে, ১১ই মার্চের ঘোষণার বিরুদ্ধবাদিতা বস্তুতঃপক্ষে ইরাকী সমাজব্যবস্থা ও ইরাকের ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর।

একারণেই ১১ই মার্চের ঘোষণার যে কোন প্রকার বিরোধিতার আমরা নিন্দা করি এবং আমরা মনে করি যে, কুর্দিস্তান এলাকার জনগণের স্বার্থে ১১ই মার্চের ঘোষণার বিষয়বস্তু ও স্বায়ত্তশাসন আইন বলবত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কুর্দিস্তানের বিষয় অনেক আলোচনা এবং বাস্তবধর্মী আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে এই আলোচনার শুরু হয়েছে ১৯৭৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে যা ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চের পর থেকে আজ পর্যন্ত আলোচিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যাপক আলোচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মোড় নিয়েছে। প্রধানতঃ সংশোধনী ও সোপারেশ পেশ করার ফলেই আলোচনা এমন বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করে।

এসব ঘটনার উদাহরণস্বরূপ আমরা পূর্ব কথিত কুর্দিশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিনিধিদের সাথে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনার কথা উল্লেখ করতে পারি। ইরাকের জাতীয় পরিষদে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিনিধিদের পক্ষে কথা বলছিলেন জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ আবাদ-আল-রহমান। সে আলোচনায় অন্যান্য প্রতিনিধিসহ কুর্দিগণ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জনাব হাবিব মোহাম্মদ করিমও উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে ন্যাশনাল ফ্রন্টের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলাম আমি নিজে,জনাব মোকাররম আল-তালাবানী, জনাব গনিম আব্দ আল-জলিল এবং বাথ আরব সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যান্য প্রতিনিধি। এতদভিন্ন জনাব হিশাম আল-শাবী এবং জনাব আব্দ আল-লতিফ আল-সাওয়াফের মত স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং জনাব ইবনে শিরজাদ

ও জনাব ফুয়াদ আরিফের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কুর্দী নেতারাও উক্ত আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শুরু করে জনাব হাবীব মোহাম্মদ করীম সোজাসুজি বলেন যে, সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই জাতিসংঘে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন। আমরা তখন বলেছিলাম যে, এটা কোন নয়া রাষ্ট্র স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে না, বরং আমরা স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আলোচনা করছি। তাঁকে যখন বুঝানো হলো যে, স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি বৃহত্তর ইরাক রাষ্ট্রের আওতায় আলোচিত হচ্ছে, তখন তিনি মাফ চাইলেন এবং স্পষ্টভাবেই বলেন যে, আসলে বিষয়টিকে তিনি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের প্রশ্ন হিসাবে তুলে ধরতে চান নাই। তিনি অবশ্য মাফ চেয়েছিলেন এবং কথাটা এড়িয়েও গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর মনে তদ্রূপ একটা কিছু ছিল।

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ন্যাশনাল ফ্রন্ট যে খসড়া তৈরী করে ১৯৭৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারীখে তা কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নিকট পেশ করা হয় এবং ন্যাশনাল ফ্রন্ট ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৯৭৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারীখে এবিষয়ে একটি আলোচনা-বৈঠক বসে। প্রকৃতপক্ষে এ আলোচনা ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ পর্যন্ত চলে এবং শেষদিকে কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিনিধিদের সভায় অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু ইরাকের বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে জাতীয় মতামত প্রকাশের এই প্রচেষ্টায় কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিনিধিগণ নিজেদের মতামত সংযোজনে অনীহা প্রকাশ করলেও ন্যাশনাল ফ্রন্ট যথাসময়ে স্বায়ত্তশাসন আইন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমাদের মতে এই খসড়ায় ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চের ঘোষণার মৌলিক বিষয়াদি সবই রয়েছে। এটা আসলে হল

এমন একটি খসড়া আইন, যা বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন দেশের জনগণের অভিজ্ঞতার আলোকে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে।

এর পরে যে প্রশ্নটি আসে তাহল স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের বিষয়। সীমানা নির্ধারণের বিষয়টিতে আলোচনা শুরু হলে আমরা তাদের বলেছিলাম যে, এব্যাপারে কতিপয় নীতি মেনে চলতে হবে। এই নীতিগুলির মূল কথা হল, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বায়ত্ত-শাসিত এলাকাকে এই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রেখে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। এটা এরূপ কিছু হবে না যাতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে আলাদা করে সেখানে সব কুর্দীদের একত্রে রেখে দেওয়া হবে। আমরা এরূপ কিছুকে স্বীকার করে নিতে পারি না, যাতে কুর্দী ব্যতীত অপরাপরকে উক্ত এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হবে। আমরা যা বলতে চাই তা হল, স্বাধীনভাবে মেলামেশার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে যাতে রাষ্ট্রীয় সীমানার সব অঞ্চলে ইরাকের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। এটা কোন কাজের কথা নয় যে, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিটি লোককে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে এবং আমরা তাদের ছায়া অনুসরণ করতে থাকব। এ বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, ইরাকে মূলতঃ দু'টি প্রধান জাতি এবং আরো কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বসবাস করে।

ইরাকী সমাজটিই এধরনের। কারবালা এবং আরবিলে যেমন আরব নাগরিকদের দেখা যাবে, তেমনি আবার কুর্দী ইরাকীদের অবস্থানও কিরকুক এবং বসরাতে লক্ষ্য করা যাবে। হয়তবা বিষয়টি ঠিক এরূপ যে, কুর্দী অঞ্চলে বসবাসরত কুর্দী জনগণের চেয়ে ইরাকের অন্যান্য অংশে বস-বাসরত কুর্দীদের সংখ্যা অধিক। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়ার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে কি বিবেচনা করা সম্ভব?

এভাবে বিবেচনা করলে আসলে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভবই হবে না।

অতঃপর দেখা গেল যে, আমাদের কুর্দী ভাইয়েরা যখনই অসুবিধায় পড়েন, তখনই ইতিহাসের কথা উথাপন করেন। তারা বলেন যে, এ জায়গায় অথবা ঐ স্থানে যে কুর্দীরা বসবাস করত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। জবাবে বললাম যে, জাতিগত প্রশ্নে ইতিহাসের কথা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু সীমানা নির্ধারণের প্রশ্নে তা সম্ভব নয়।

ইতিহাসের কথাই যদি উল্লেখ করতে হয়, তাহলে বলা যায় যে, ইতিহাসের ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক রীতি-নীতিতেও স্বীকৃত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আরবরা একালে স্পেনকে আরবদের দেশ বলে দাবী করতে পারে না। তাছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি বিবেচনা করছি এরূপ একটি যুক্তিযুক্ত কাঠামোর মধ্যে, যেখানে ইরাকের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষিত হবে এবং সংহতি বৃদ্ধির মাধ্যমে ইরাকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

এরপর আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসিত এলাকার জন্য একটি বিশেষ বাজেট প্রণয়নের প্রসঙ্গটি উথাপন করলেন। তাতে বলা হল যে, কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের জন্য সম্পদ বন্টন করে দিতে হবে। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বিনীতভাবে জানালাম যে, স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে এ প্রসঙ্গটি আসে না। কারণ, ফেডারেশনের প্রশ্ন হলে বিষয়টি এভাবে বিবেচনা করা সম্ভব হত। তাছাড়া একটি একীভূত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এ ধরনের প্রশ্ন উথাপন করা সমীচীনও নয়।

ইরাকী জনগণকে একটি জাতি হিসাবে ধরে নিলে ইমারার সরকারকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ইরাকের আয়ের একটি অংশ দিয়ে দেওয়ার কথাটি কি সঙ্গত, এই ভিত্তিতে কাজ করে গেলে দেশের জন্য একটি ভারসাম্য

রক্ষিত অর্থনীতি আমরা গড়ে তুলব কি ভাবে? আমরা ইরাকী সমাজের অনুন্নত এলাকাগুলির বিষয়ে উদ্বিগ্ন। যেখানে এবং যে অবস্থাতেই তা থাকুক না কেন, সেখানকার উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের আমরা পক্ষপাতি। কিন্তু তাই বলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের সম্পদকে বণ্টন করে তো দেয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ এটা বলা যায় যে, কুর্দিস্তানের উন্নয়নের জন্য বাজেটে বিশেষ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা ঠিক এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, কুর্দিস্তান অঞ্চলের জনগণের প্রতি এটা আমাদের একটা দায়িত্বও বটে। কুর্দিস্তান অঞ্চলের জন্য পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি বিশেষ অধ্যায় রাখা হচ্ছে। এটা অবশ্যই যথার্থ বিষয় এবং আমরা এ লক্ষ্যে কাজও করে যাব।

আমরা যে খসড়া স্বায়ত্তশাসনমূলক আইন প্রণয়ন করেছি, তা আমরা নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই প্রকাশ করব। হয়তবা কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, খসড়টি দু'মাস পরে প্রকাশ করলেই বা ক্ষতি কি? এর উত্তর হল যে, আমরা নির্দিষ্ট তারীখ অর্থাৎ, ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ তারীখেই খসড়াটি প্রকাশ করতে চাই। কারণ, কুর্দী জনগণ ইতিপূর্বে আমাদের পূর্ববর্তী শাসকদের কাছ থেকে অনেক আশ্বাস পেয়েছে যা কোন দিনই পূরণ করা হয় নাই। অতএব আমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য, কুর্দীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আনয়ন করার জন্য এবং ইরাকের সরকার ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা রক্ষার জন্য আমরা স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত খসড়া আইনটি অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে সর্বসমক্ষে পেশ করব।

ইরাকের অন্যান্য এলাকার জনগণের চাইতে কুর্দী জনগণের জন্যই এই ঘোষণাটির অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এটা তাদের প্রয়োজন এবং এর কথা তারা বিগত ১৯৭০ সাল থেকে শুনে আসছে। এই বিলম্বের ফলে স্বার্থান্বেষী অনেক মহল কুর্দীদের মধ্যে এ বিষয়ে সর-

কারের আন্তরিকতা সম্পর্কে অনেক গুজব ছড়িয়েছে। অতএব এটাকে আমরা কেবলমাত্র একটি ঘোষণা বলেই মনে করি না, এ ঘোষণাটির বাস্তব তাৎপর্যও রয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ১৯৭৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী থেকে এতদসম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য ভিন্নরূপ। আলোচনা আসলে শুরু হয়েছে ১৯৭০ সনের ১১ই মার্চ থেকে এবং চলেছে আজ অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ পর্যন্ত।

আমরা যদি খসড়াটির ঘোষণার সময় আরো একমাস পিছিয়েও দেই, তাহলে বিগত চার বছরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এর আর কতটুকু উন্নতি হবে? আমরা অবশ্য বিষয়টিকে যে একেবারে উপেক্ষা করেছি, তা নয়। এরই মধ্যে আমরা ভ্রাতা ইদরীস বারজানীর সাথে আলাপও করেছি এবং কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চিন্তায় নতুন কিছু আছে কিনা জানতে চেয়েছি। তিনি বলেছেন যে, তাঁরা বিরোধিতা করতে চান না, বরং সমস্যার একটি সমাধান চান। তিনি প্রায় একঘণ্টা ধরে কথা বলেছেন এবং যা বলতে চেয়েছেন তাহল এই যে, পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছু করা দরকার। আমরা তাকে বলেছি যে, আমরাও এটাই চাই। এবিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন অনৈক্য নাই। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, কি উপায়ে এ বিশ্বাস রক্ষা করা সম্ভব হবে? পারস্পরিক বিশ্বাসের বিষয়টি কোন ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক প্রশ্ন নয়। এটা আসলে মূল বিষয়টির সামগ্রিক বিবেচনা থেকে উৎসারিত। আমরা এসব বিষয়ে অভিন্নভাবে একে অপরের দিকে এগিয়ে যাব তখনই এই বিশ্বাস অটুট থাকে এবং এর বিপরীতে এ বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। অঙ্গীকার রক্ষার মধ্যেই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং ইরাকী জনগণ বিশেষ করে কুর্দিস্তানের অধিবাসী-দের প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার আমরা রক্ষা করব। এর অর্থ এই যে,

নির্ধারিত শেষ দিনটি অর্থাৎ, ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ থেকে আমরা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কার্যকর করব।

জনাব ইদ্রীস বারজানীকে আমরা বলেছিলাম যে, আপনি যেসব কথাবার্তা বলছেন, এ ধরনের কথা কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের কাছ থেকে আমরা অনেক দিন ধরে শুনে আসছি। কিন্তু তথাপি পারস্পরিক বিশ্বাসের অবনতিই ঘটেছে, ঐক্যমতের মাধ্যমে এরূপ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই, যা ইরাকী ও কুর্দী জনগণের নিকট পেশ করা সম্ভব হয়। অতএব ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চের পূর্বে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আন্তরিক ও প্রত্যক্ষ ধরনের প্রস্তাব আশা করেছিলাম, যা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা সম্ভব হবে। আমরা আরও বলেছিলাম যে, আজ থেকে অর্থাৎ, ১৯৭৪ সালে ৯ই মার্চ থেকে আগামী ১১ই মার্চের দুপুর ১২টা পর্যন্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলের অংশ হিসাবে আপনাদের নিকট থেকে বাস্তবধর্মী প্রস্তাব আশা করি, এই প্রস্তাব যে কোন ধরনের হতে পারে যা স্বায়ত্তশাসন ঘটিত খসড়া আইনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। খসড়া আইন ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চের বেলা ১১টায় ঘোষণা করা হবে। অবশ্যই এর পরেও আরো ১৫দিন সময় দেওয়া হবে, যে সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা চালানোর সুযোগ থাকবে। এই সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কোন ঘটনা না ঘটানো হলে সবার প্রতি আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় থাকবে। তবে এর অন্যথা ঘটলে আমাদের পক্ষেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকবে না।

প্রসঙ্গতঃ প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আরও বলেন যে, সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হলে বলতে হয় যে, আরব বাথ সোশ্যালিষ্ট পার্টিসহ সবগুলি দলই জনসংখ্যার অনুপাতে সংখ্যালঘিষ্ট। কিন্তু অনেক সময় এগুলি আবার সংখ্যাগুরুও হয়ে উঠতে পারে।

ইরাকী সমাজ ব্যবস্থায় অনেকগুলি দল রয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্য যে, এই সমাজের অনেকেই সক্রিয়ভাবে কোন দলের সঙ্গে যুক্ত নহেন। এর অর্থ এই যে, এই লোকগুলি কোন সংঘটিত দলের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হন না। অথচ লক্ষ্যযোগ্য যে, সব দলই জনমতের প্রতিধ্বনি করার দাবী করে থাকেন। এই বিবেচনা থেকে এটাও বলা চলে যে, আরব বাথ সোস্যালিষ্ট পার্টি কেবলমাত্র আরব জনগণের সমন্বয়ে গঠিত পার্টি বিশেষ নয়, বরং যারা আরবদের ভবিষ্যতের বিষয়ে আগ্রহী এবং আরব জাতিসমূহের সংগ্রামে নিজে-দের অংশীদার বলে মনে করেন, তাদের সবাই এই দলের সদস্যভুক্ত হতে পারেন। আরব কুর্দী ও অন্যান্য সব সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকেই এই দল দায়িত্ব পালন করে থাকে।

আমি যখন ন্যাশনাল ফ্রন্টের পক্ষ থেকে কথা বলি, তখন আমি ফ্রন্টের সদস্যদের পক্ষ থেকেই কথা বলি। আবার দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিও কেবল আরবদের পক্ষ থেকেই কথা বলে হিসাবে বিবেচনা করে না। এই দলের আরব, কুর্দী ও অন্যান্য সংখ্যক সদস্য রয়েছে। আবার দলটির রয়েছে নিজস্ব মতবাদ ও নীতি। অতএব এটা নিশ্চিতরূপেই সত্য যে, কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টিই কেবল কুর্দীদের একমাত্র দল নয়, তবে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একটা কথা রয়েছে—এই যা। কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই ভূমিকার গুরুত্ব নির্ভর করে ইরাকী সমাজ-ব্যবস্থা গঠন ও পরিচালনায় কুর্দীদের আশা-আকাংখা দলটি কতটুকু প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়, তার উপর। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই খসড়া আইন সম্পর্কে তাদের মনোভাবের বিষয়টি এখানে এসে যায়। আমরা যা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, তা হল এই যে, কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃবৃন্দকে খসড়া আইনের বিষয়ে অন্যান্য দলগুলির সমন্বয়ে গঠিত ন্যাশনাল ফ্রন্টের আওতায় আসতে হবে এবং এই বিষয়ে অন্যান্য দলের সাথে সমবেতভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি অনুসরণ করতে হবে।

এই কথার অর্থ যেন এইভাবে ধরে নেওয়া না হয় যে, কুর্দীশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভূমিকার অবসান ঘটানোর জন্য কোন পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের কথা হল যে, জনগণের দায়িত্বে নিযুক্ত রাজনীতিবিদগণের মনোভাব শুধুমাত্র একটি দিকে নিবদ্ধ রাখলে চলবে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য তাদের উন্মুক্ত মন নিয়ে বিভিন্ন পথের সন্ধান করতে হবে। এই কারণেই ১৯৬৮ সালের বিপ্লব যে আদর্শের জন্ম দিয়েছে, সেই আদর্শ বাস্তবায়নের কাজে কুর্দীশ ন্যাশনাল পার্টির নেতৃবৃন্দের যথাযথ ভূমিকার জন্য আমরা উদ্বেগাকুল চিত্তে অপেক্ষমান।

আমরা আমাদের সমাজে কোনরূপ অঘটনের সুযোগ দিতে পারি না, তা যত ক্ষুদ্রই হোক। আমরা সংঘবদ্ধ হতে চাই, বিচ্ছিন্নতা অথবা কলহ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সংঘবদ্ধ দল অথবা সাধারণ জনগন সবার মধ্যেই শুভেচ্ছা ও প্রীতি জাগ্রত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা সীমান্তের অশুভ শক্তিগুলির মোকাবিলা করতে চাই।

আমরা জানি যে, কুর্দী এলাকার শ্রান্ত জনগণ এবং আমাদের ইরাকী জনগণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা কামনা করেন। তারা গঠনমূলক কাজ ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বিষয়ে আগ্রহী। কিন্তু আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই যে, আমরা রাজনীতিবিদেরা এই বিষয়টি এখনও লক্ষ্য করছি না। অতএব কুর্দী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ যদি কুর্দী জনগণের জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে খসড়া আইনের বিষয়ে প্রগ্রেসিভ প্যান আরব ন্যাশনাল ফ্রন্টের সাথে একমত হন, তাহলে আমরা খুশী হব।

একই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আরো বলেন যে, আমরা একথা অবশ্যই বলব, সামাজিক ব্যবস্থার বিপরীতার্থক সব বিষয়াদি সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট নয়। তবে এটা ঠিক যে, এই অস্বাভাবিক বিষয়াদি নিজস্ব পরিকল্পনার জন্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে কাজে লাগানো হয়। এর একটি বিষয় হল সামাজিক অনৈক্যের কথা। বিশেষ করে এটা তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য।

যাহোক এই আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, কুর্দী সমস্যাটি খুবই পুরাতন বিষয় এবং ইরাকের বিপ্লবী সরকার অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রেই এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পেয়েছে।

কুর্দীদের বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলি এমনকি বৃহৎ শক্তিগুলোও রাজনৈতিক চাল খেলতে কসুর করে নাই এবং এই খেলার পরিণতি প্রধানতঃ ইরাকীদের বিরুদ্ধেই গেছে। স্বাভাবিকভাবেই ইরান ও ইরাকে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই ইস্যুটিকে ব্যবহার করেছে এবং মোহাম্মদ রেজা শাহের সময়ে ইরান কুর্দীদের শুধুমাত্র নৈতিক সাহায্যই দেয় নাই বরং আর্থিক এবং অস্ত্র সাহায্যও দিয়েছে। বিষয়টি এক সময়ে ইরাকের জন্য খুবই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে, ইরাকে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হলে ইরানের শাহ নিজের রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন এবং এই বিপ্লবকে নস্যাৎ করার জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালান। এই সময়ে তিনি কুর্দীদের বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা দানের মাধ্যমে ইরাক সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। ইরাকের জন্য এটা ছিল খুবই দুঃসময় এবং এইরূপ পরিস্থিতিতেই ইরাকের বিপ্লবী সরকার ইরানের সাথে একটি সমঝোতায় আসতে অনেকটা বাধ্য হন, যার ফলশ্রুতি ছিল আলজিয়ার্স চুক্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, ইরান এই চুক্তির শর্তাবলী বিভিন্নভাবে ভঙ্গ করছে এবং এমনকি কুর্দীদের জন্য আর্থিক এবং অস্ত্র সাহায্যও অব্যাহত রেখেছে।

ইতিমধ্যে ইরানে শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ইরাকীদের সহানুভূতি লাভ করে এবং তারা বিপ্লবের নায়ক আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনীকে শর্তাধীন রাজনৈতিক আশ্রয় দেন। অতঃপর খোমেনী যখন ইরান ফিরে যান, তখন ইরাকীরা সঙ্গতভাবেই খোমেনী সরকারের সাথে উত্তম ব্যবহার আশা করেছিল। কিন্তু যতদূর মনে হয়, প্রধানতঃ

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কারণেই—যে বিষয়টি হয়তবা খোমেনী নিজেও প্রথম দিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নাই—ইরাকীদের আশা পূরণ হয় নাই এবং এমনকি কুর্দী সমস্যাসহ ভৌগোলিক সীমা সম্পর্কে খোমেনী সরকারও তৎপূর্ববর্তী শাহের নীতিই অনুসরণ করতে শুরু করেন।

খোমেনীর অভিযান

এই পর্যায়ে একটি বিষয় লক্ষ্যযোগ্য যে, শত বিরুদ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও স্বীয় অভিজ্ঞতার কারণে শাহ ইরাকের বিরুদ্ধে সার্বিক চরম পন্থা কখনোই গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু খোমেনী এইরূপ মনোভাব গ্রহণে ব্যর্থ হন প্রধানতঃ তিনটি কারণে। প্রথমতঃ ইরানের যুবশক্তি শাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থাকা কালে যেভাবে উশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল, খোমেনীর পক্ষে তা নিবৃত্ত রাখা সম্ভব ছিল না, দ্বিতীয়তঃ স্বীয় শক্তি সংহত করার জন্য খোমেনীর পক্ষে এই বিপ্লবী শক্তির দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করানোর প্রয়োজন ছিল এবং তৃতীয়তঃ ইরাকের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলো এই সুযোগ কাজে লাগানোর সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালায়।

ইরাকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

যাহোক, এসব কারণের ফল যা হয়েছিল, তা হলো এই যে, ইরানে ইরাক বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠে এবং ইরানের উশৃঙ্খল বিপ্লবী শক্তি ইরাকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়; যার ফলশ্রুতি ছিল ইরাকের কতিপয় এলাকায় ইরানী বিমান ও নৌবহরের উপর বোমা ও গোলাবর্ষণ। এটা হলো ১৯৮০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের কথা।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইরাকী বাহিনী আক্রান্ত সীমান্ত এলাকায় গমণ করে এবং ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জইন আল-কওস থেকে

ইরানী বাহিনীকে হটিয়ে দেয়। এর পর ইরাক সরকার ইরানের নিকট সরকারীভাবে একটি পত্র প্রেরণ করে এবং পত্রের মর্ম অনুসারে ১৯৭৫ সালের আলজিয়ার্স চুক্তি অনুসারে স্বীকৃত ইরানের নিকট ইরাকের হৃত ভূখণ্ড প্রত্যার্পনের দাবী জানায়। ইরানের পক্ষ থেকে এই পত্রের কোন উত্তরই দেয়া হয় নাই। অবশ্য এই পর্যায়েও যদি স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হত, তাহলে ইরাক ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের রূপ পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইরান তা না করে যুদ্ধ পরিস্থিতিকে আরও সম্প্রসারিত ও ভয়াবহ করে তোলে এবং দিয়ালা ও ওয়াসিত এলাকায় পুনরায় আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলে ইরাকী সেনাবাহিনী সইফ সা'দের দিকে অগ্রসর হয় এবং এলাকাটি পুনরুদ্ধার করে। এই যুদ্ধে সংশিষ্ট এলাকার ইরানী বাহিনীর প্রধান জেনারেল সাবনী নিহত হন। ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইরাকী বাহিনী ইরানীদের হাত থেকে আলজিয়ার্স চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য ১২৫ বর্গমাইল এলাকা উদ্ধার করে নেয়।

শাতিল আরবে আক্রমণ

বস্তুতঃ তখন থেকেই যুদ্ধ অব্যাহত গতি লাভ করে এবং ইরান নিজের আকাশ সীমায় অপর কোন দেশের বিমানের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইরান শাতিল আরব এলাকায়ও বোমা ও গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে এবং কতিপয় জাহাজের ক্ষতি সাধন করে। তদুপরি ইরান এই সময়ে হরমুজ প্রণালী এবং শাতিল আরব এলাকায় অপর যে কোন দেশের জাহাজের আগমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে বিষয়টি সারা বিশ্বে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এই অবস্থায় ১৯৮০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারীখে ইরাকী জাতীয় পরিষদের একটি জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হয়। অধিবেশনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইরানের পক্ষ থেকে এযাবৎ গৃহীত ব্যবস্থাবলী

কেবল ইরাককেই যুদ্ধাবস্থার টেনে আনে নাই, বরং এর ফলে সারা বিশ্ব রীতিমত বিপাকে পড়ে যায়। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী ও শাতিল আরব এলাকা অন্যান্য দেশের জাহাজগুলির জন্য নিষিদ্ধ এলাকা হিসাবে ঘোষিত হওয়ায় একদিকে যেমন সারা বিশ্বে তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়, তেমনি আবার তেল সরবরাহকারী দেশগুলির জন্যও এটা ছিল একটা মারাত্মক আঘাত। সুতরাং অবস্থার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এই অধিবেশনের ফলাফল জানার জন্য সারা বিশ্ব উদগ্রীব হয়ে থাকে। একটি চাপা উত্তেজনা ও উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে এই অধিবেশন শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের পুর্বেই প্রতিনিধি-গণ পরিষদ গৃহে উপস্থিত হন এবং যথাসময়ে তারা আসন গ্রহণ করার পর প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন পরিষদ কক্ষে উপস্থিত হন।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ঘোষণা

এই ঐতিহাসিক ভাষণে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এর বাস্তবায়নের জন্য, বিশেষ করে চুক্তিতে উল্লেখিত সীমা নির্ধারন, সীমান্তে খুঁটি স্থাপন এবং অন্যান্য বিষয়াবলী সুনির্দিষ্ট করার জন্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তি অনু সারে তিনটি মৌলিক প্রটোকলও স্বাক্ষরিত হয়। এগুলি ছিল নদী সীমান্ত, স্থল সীমান্ত এবং সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত।

সীমানা নির্ধারণের বিশেষ করে, শাতিল আরবের এলাকায় সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইরানী পক্ষ প্রথম দিকে কিছুটা সুবিধা করে নিয়েছিল। তবে মুল সীমান্ত নির্ধারণের বিষয়ে যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে যায়। ১৯৭৯ এবং ৮০ সালের দিকে ইরানের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি ইরাককে ফিরিয়ে দিতে ইরানের বিলম্ব হয়ে যায়। একই অবস্থার কারণে ইরানের নয়া সরকারও যে, এ বিষয়ে কিছু অধিক সময় ব্যয় করবে তা আমরা ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ইরানের বর্তমান

সরকার ক্ষমতাশীল হওয়ার প্রথম দিন থেকেই আমরা তাদের অপ্রতিবেশীমূলক আগ্রাসী মনোভাব লক্ষ্য করেছি। অতএব এই চুক্তি বাতিলের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে তাদের উপরই বর্তাব।

যেহেতু ইরানের বর্তমান সরকার আমাদের সাথে প্রথম দিন থেকেই শত্রুতামূলক আচরণ করে আসছে, তারা ইরাকের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে চুক্তি অনুসারে ইরাকের প্রাপ্য এলাকা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করছে এবং এসব এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদিগকে শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে, সেহেতু আমি ঘোষণা করছি যে, ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চের চুক্তি অতঃপর আমাদের নিকট বাতিল বলে গণ্য হবে।

অতঃএব শাতিল আরব এলাকার আইনগত অধিকার এখন ১৯৭৫ সালের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এই নদীটির পরিচিতিতে থাকবে আরব ইরাকী বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব স্বার্বভৌম অধিকার থেকেই ইরাক এই নদীটিতে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে।

সেদিন রাতেই রেভেলিউশান কমাণ্ড কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব তারেক হাম্মাদ-আল আবদুল্লাহ ইরাকী জনগণকে জাতীয় পরিষদে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা টেলিভিশনযোগে জানিয়ে দেন। এভাবেই আলজেরীয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

আলজেরীয় চুক্তির বিষয়াবলীকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষ এই চুক্তি অনুসারে শাতিল আরবকে আন্তর্জাতিক নদীপথ হিসাবে স্বীকৃতি দান করে। এর ফলে উভয় পক্ষই নিজেদের পানি সীমায় জাহাজ চলাচলে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করেনি। (২) উভয় পক্ষ নিজেদের সাধারণ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করে এবং একে অন্যের অনুপ্রবেশ রোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় এবং (৩) এর

ফলে উভয় দেশের স্থলসীমান্ত নির্ধারণের বিষয়টি চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে।

আলজেরীয় চুক্তি বাতিল ঘোষিত হওয়ার পর ইরাকের পক্ষ থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এগুলি হল (১) শাতিল আরবে চলাচলকারী প্রতিটি জাহাজকে ইরাকের পতাকা বহন করতে হবে এবং ইরাকী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মান্য করতে হবে। (২) শাতিল আরবকে ইরাকী নদী পথ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বাগদাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। (৩) বাগদাদ কর্তৃক ঘোষিত নীতিমালা অনুসারে শাতিল আরবে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (৪) শাতিল আরব এলাকায় সংঘটিত সর্বপ্রকার বিবাদ মীমাংসার জন্য ইরাকের নিকট উপস্থিত করতে হবে এবং (৫) শাতিল আরবে চলাচলকারী জাহাজগুলিকে ইরাকী কর্তৃপক্ষকে কর প্রদান করতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, শাতিল আরব এলাকায় ইতিপূর্বেও ইরান এবং ইরাকের কোন পক্ষই ১৯৭৫ সালে আলজেরীয় চুক্তি বাস্তবায়িত করে নাই। এই বিষয়টি ইরানী রাষ্ট্রপ্রধান আবুল হাসান বনি সদর স্বীকার করেছিলেন। এর জন্য তিনি শাহের আমলের ঘটনাবলীকেই দোষ দিয়েছিলেন। তাছাড়া প্রাসঙ্গিকভাবে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদী ও এক সময় বলেছিলেন যে, আলজেরীয় চুক্তি অনুযায়ী এই চুক্তির কোন একটি শর্ত ভঙ্গ করলে সম্পূর্ণ চুক্তিটিই বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা, অথচ জইন আল—কওস এবং সাইফ সাদ এলাকায় ইরান চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে।

যাহোক, ১৭ই সেপ্টেম্বের ইরানীরা শাতিল আরব এলাকায় প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ শুরু করে। মোহাম্মারাহ বন্দর এবং আবাদান বিমান বন্দরে তীব্র লড়াই শুরু হয়, একই সময়ে ইরানী সশস্ত্র বাহিনীর দফতর থেকে ঘোষণা করা হয় যে, অতঃপর সারা শাতিল আরব

এলাকাতেই যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। সদর দফতরের ঘোষণায় একমাত্র স্বীকার করা হয়েছিল যে, শাতিল আরবের ইরাকের দিকে ইরানীরা ক্ষেপণাস্ত্রসহ প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করেছে। এর পরই ইরাকীরা আবাদান বন্দর ও সন্নিহিত এলাকায় ইরানীদের পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজের ক্ষতি-সাধন করে।

ইরাকী পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ওরিয়েন্ট ষ্টার নামক একটি বৃটিশ জাহাজ ইরানী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর ইরাকীরা ইরানীদের যুদ্ধ জাহাজগুলি আক্রমণ করে। বৃটিশ জাহাজটি ইরাকের বসরা বন্দরের অভিমুখে গমন করছিল। একই সঙ্গে ইরানীরা একটি কুয়েতী জাহাজ এবং অপর একটি সিঙ্গাপুর থেকে আগত জাহাজকে আক্রমণ করে বলেও ইরাক অভিযোগ উত্থাপন করে।

২১শে সেপ্‌টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আলজেরীয় চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য সব এলাকা ইরাকী বাহিনী পুনরুদ্ধার করে ফেলে। এরপর যুদ্ধাবস্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ইরানের প্রতি ইরাক আহবান জানায়, কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে একই দিন অর্থাৎ, ২১শে সেপ্‌টেম্বরের বিকালের দিকে ইরান নয়াভাবে সামরিক অভিযান শুরু করে। ইরানীরা এই অভিযানে ইরাকীদের শহর, কল-কারখানা স্কুল এবং এমনকি হাসপাতালও বাদ দেয় নাই। এর পর উভয় পক্ষে এরূপ প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয় যে, পরবর্তী ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত ইরান বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে সংযোগবিহীন হয়ে থাকে।

যুদ্ধ ঃ *বিশ্ব প্রতিক্রিয়া*

ছোটখাট সংঘর্ষ সরাসরি যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করায় এবং ইরান কর্তৃক শাতিল আরবে জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা বানচালের চেষ্টা কিছুটা ফলপ্রসূ হওয়ায় ইরাকের বিপ্লবী কম্যাণ্ড কাউন্সিল বিষয়টি নিষ্পত্তির

জন্য শেষ পর্যন্ত চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং ২২শে সেপ্‌টেম্বর তারীখে ইরাকী বিমান বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরস্থ ১০টি সেনানিবাস ও বিমান ঘাঁটিতে যুগপৎ আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ এত ভয়াবহ ছিল যে, এর ফলে কেরমানশাহ, সামান্দাজ এবং আল আহওয়াজ বিমান ঘাঁটিগুলিসহ হামাদান, তেহরান, ইস্পাহান, দেজফুল শিরাজ এবং তব্রিজের সেনানিবাসগুলির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ইরান এর প্রত্যুত্তরে ইরাকের অভ্যন্তরস্থ ওয়াসিত এবং বসরায় বিমান হামলা চালায়। তাছাড়া এই সময়ে ইরানের পক্ষ থেকে উপসাগরীয় দেশগুলিকেও ইরানের অভ্যন্তর ভাগে হামলা পরিচালনা না করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২৩শে সেপ্‌টেম্বর তারীখে যুদ্ধ পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইরাকীরা এই দিন বাগদাদ, মিনেভ এবং বসরা নগরীর বিমান বন্দরসহ মোট ছয়টি বিমান বন্দরে বোমা-বর্ষণ করে এবং এ সব শহরের তেল শোধনাগারসহ রাসায়নিক কার-খানাগুলির চরম ক্ষতিসাধন করে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরাকী সেনাবাহিনী ইরানের অভ্যন্তরভাগে এগিয়ে যায় এবং সুমার, কাসরে শিরিন, জাহাব এবং কারমাল গ্রামগুলিসহ ইরানের পনর কিলো-মিটার এলাকা দখল করে নেয়। তাছাড়া ইরাকীরা মোহাম্মারাহ শহরের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করাসহ আবাদান তেল শোধনাগারের অংশবিশেষও ধ্বংস করে দেয়। এ সময়ই শাতিল আরব এলাকাতেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং তা আন্তর্জাতিক গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিশেষকরে ইরান কর্তৃক হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়ার হুশিয়ারি প্রদান করার পর শিল্পোন্নত দেশগুলি এই কারণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে যে, এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিষয়টি লক্ষ্য করে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ঘোষণা করেন যে, "ইরান কর্তৃক হরমুজ প্রণালী দখলের প্রচেষ্টার ফলে পরিস্থিতি সামগ্রিক যুদ্ধের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে এবং এর ফলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে

তাতে এ এলাকায় যে কোন সময় বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই নয়া পরিস্থিতিতে ইরাকের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়। অতএব ইরাক নিশ্চিতভাবেই এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ইরাকী কর্তৃপক্ষ অপরের অধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়।

এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সুবিবেচনাপ্রসূ হবে বলে আমরা মনে করিনা। কারণ, উভয় পক্ষেই একে অন্যের ক্ষতিসাধনের এরূপ ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে যে, তন্মধ্যে সত্যতার ভাগ নির্ণয় করা একটি কঠিন বিষয়।

জাতিসংঘের প্রচেষ্টা

যাহোক, ঘটনাটি যে খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গতঃ আমরা এতদসম্পর্কিত কতিপয় আন্তর্জাতিক বিষয় উল্লেখ করব। ২২শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ড হেইম উভয় পক্ষের প্রতি যুদ্ধ বিরতি পালন করার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করার আবেদন জানান। ইরাক এই আবেদনের প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করে, তবে এই আবেদন কার্যকরী করার প্রেক্ষিতে তিনটি শর্ত উল্লেখ করে। এই শর্তগুলির প্রথমটি ছিল যে, ইরাক ও ইরানের সীমানা নির্ধারণ, ইরাকী সীমান্ত এলাকা সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ শাতিল আরবে ইরাকী সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হবে এবং তৃতীয়তঃ আবু মুসা ও দুটি তাম্ব দ্বীপ থেকে ইরানী বাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কিন্তু লক্ষ্যযোগ্য যে, ইরানের পক্ষ থেকে এই আবেদনের কোন উত্তরই দেয়া হয় নাই।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রতিক্রিয়া

ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেন ফ্রেঙ্কোসের প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ এই ভয়াবহ সংকট সম্পর্কে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের নয় সদস্য-বিশিষ্ট একটি কমিটি হরমুজ প্রণালীর ব্যাপারে ইরানী হুশিয়ারী সম্পর্কে বলেন যে, (১) এই কমিটি ইরাক ও ইরানের মধ্যকার সামরিক সংঘর্ষের কারণে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। (২) কমিটি এবিষয়ে বৃহৎ শক্তি-বর্গের নিকট কোনরূপে এই সংঘর্ষে জড়িয়ে না পড়ার আবেদন জানাচ্ছে। (৩) অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা সংক্রান্ত জাতিসংঘের এবং ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেলদ্বয়ের আবেদনের প্রতি কমিটি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছে এবং সুষ্ঠুভাবে এই মতামত প্রকাশ করছে যে, এই সংঘর্ষের একটি রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্য তারা যে কোন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় শরীক হতে সম্মত রয়েছে। (৪) কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে এই এলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আবেদন জানাচ্ছে এবং (৫) সম্ভব হলে কোন একটি সমাধানে পেঁছার জন্য কমিটি নিজেও প্রস্তুত রয়েছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ২৩শে সেপ্টেম্বর, তারিখে এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের একটি জরুরী অধিবেশনও আহ্বান করা হয়। কয়েক ঘণ্টা আলোচনার পর পরিষদের তিউনিসীয় প্রেসিডেন্ট জনাব তৈয়ব সেলিম বলেন যে, যুদ্ধ সম্প্রসারিত হওয়ার আশংকায় এবং এতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় পরিষদের সদস্যবর্গ এই সংঘর্ষের কারণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সদস্যবর্গ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ তারিখে এ বিষয়ে উভয় পক্ষের প্রতি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল যে আবেদন জানিয়েছেন তা সর্বতোভাবে সমর্থন করে এবং এই সমস্যা সমাধানে সেক্রেটারী জেনারেল মধ্যস্থতার যে প্রস্তাব দিয়েছেন সে সম্পর্কেও পরিষদ সম্পূর্ণ একমত। পরিষদের

সদস্যবর্গ আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুসারে ইরাক ও ইরানের উভয় সরকারের নিকট আমি প্রথমে যুদ্ধ বন্ধ করার, এবং এরূপ কিছু না করার যাতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। নিরাপত্তা পরিষদের এই বৈঠকে সালাহ ওমর আল-আলী ইরাকের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ ইরানী প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের এই বৈঠকে অংশগ্রহণও করেন নাই।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতদ্বৈধতা

বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডমণ্ড মাস্কি সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকোর সাথে নিউইয়র্কস্থ প্রতিনিধিদলের সদর দফতরে এক আলোচনায় মিলিত হন।

তাঁদের এই আলোচনা মূলতঃ ইরাক-ইরান সংঘর্ষকে নিয়েই এগিয়ে চলে। কিন্তু এই আলোচনার ফলাফল থেকে মনে হয় যেন উভয় পক্ষই সরাসরি কোন কিছু বলতে অথবা করতে ইতস্ততঃবোধ করছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত বিরূপ ফলাফল প্রদান করে। কারণ, প্রধানতঃ এ জন্যই এই সমস্যা সম্পর্কে সমাধানসূচক সরাসরি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে তখন সম্ভব হয় নাই।

ফ্রান্সের উদ্বেগ

উপসাগরীয় এলাকার সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠার প্রেক্ষিতে ফ্রান্স বরাবরই উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছে। ফ্রান্স এবারও উপসাগরীয় এলাকার সংকটের প্রশ্নে দারুন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসী কেবিনেটের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি ইশতেহার প্রকাশ করে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয় যে, উপসাগরীয় এলাকায় সামরিক

আক্রমণাত্মক কোন কাজ ফরাসী সরকার পসন্দ করেন না। ইশতেহারে বলা হয়, ইরাক ও ইরানের মধ্যে সামরিক তৎপরতায় ফরাসী সরকার গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ফরাসী সরকার মনে করেন যে, যে সব কারণে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছে সেগুলি দ্বি-পাক্ষিক এবং এইগুলির জন্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ফরাসী সরকার বৃহৎ শক্তিবর্গের সংহত মনোভাব আশা করেন। ফরাসী সরকার সারা বিশ্বের জন্য উপসাগরীয় এলাকায় জাহাজ চলাচলের বিষয়টি নির্বিঘ্ন রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মনে করেন যে, এই পরিবহণ ব্যবস্থাকে কিছুতেই বানচাল করে দেয়া যায় না।

উপসাগরীয় এলাকায় বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ফরাসী সরকার যখন আলোচনায় বসেছিলেন, তখন ইরাকী প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সব কিছু অবহিত করার জন্য ইরাকের বিশেষ দুত জনাব তারিক আজিজ একটি পত্র নিয়ে ফরাসী প্রেসিডেন্ট ভ্যালারী জিসকার্ড-এর সমীপে উপস্থিত হন। জনাব তারিক আজিজ প্যারিসে উপস্থিত হওয়ার আগে তিন দিনের সরকারী সফরে মস্কো গিয়েছিলেন। এই সফরে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সাথেও তিনি সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

ফরাসী প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের পর ১৯৮০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের অপরাহ্নে জনাব তারিক আজিজ প্যারিসস্থ ইরাকী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। এই সম্মেলনে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের একশত পঞ্চাশটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে ইরাক ও ইরানের মধ্যে উপসাগরীয় এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনার সম্ভাব্যতার প্রশ্নে ইরাকের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জনাব তারিক আজিজ বলেন: নিজেদের রক্ষা করা ব্যতীত আমাদের অপর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নাই। বিরোধী পক্ষ যদি

আমাদের সাথে আলোচনা করতে চান তাহলে তাতে অসম্মত হওয়ারও আমাদের কোন কারণ নাই। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগের সম্ভাবনাকেই আমরা নাকচ করে দিতে চাই না। এই প্রচেষ্টা কেবলমাত্র ইসরাঈল ব্যতীত বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই হতে পারে। কারণ, ইসরাঈলকে আমরা রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করি না। ইরাক সংঘর্ষকে দীর্ঘমেয়াদী করতে চায় না। আজই যদি ইরানী কর্তৃপক্ষ ইরাকের সাধারণ দাবিগুলি মেনে নেয়, তাহলে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে ইরাকী কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত রয়েছেন।

এই পর্যায়ে ইরাকের দাবিগুলিও আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। প্রসঙ্গতঃ ইরাকের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জনাব তারিক আজিজ যে দাবিগুলির কথা বলেছিলেন তা হল : (১) ইরাকের রাষ্ট্রীয় সীমানায় অবস্থিত সব এলাকার উপর ইরাকের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে ইরানের সম্মতি। (২) ইরাক ও আরব দেশগুলির সাথে ইরানের প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপন। (৩) ইরান কর্তৃক প্রতিবেশী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। (৪) ইরান কর্তৃক সর্বপ্রকার আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ রাখা।

এই শর্তগুলি উল্লেখ করে জনাব তারিক আজিজ একথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের দাবিগুলি এ ধরনের সাধারণ হওয়ার কারণ এ নয় যে, আমরা দুর্বল, বরং আমাদের দাবী ন্যায্য বলেই আমরা বিষয়গুলি এভাবে পেশ করছি।

যাহোক ২৪শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে ইরাকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সাদুন হাম্মাদী নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রস্তাবের জবাবে তাদের কাছে পত্র লেখেন। পত্রে বলা হয়েছিল : ইরাক মনে করে যে, ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চ তারিখে আলজেরীয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় থেকেই ইরান এই চুক্তি বরখেলাপ করে আসছে। এই চুক্তির ৪নং ধারা অনুসারে ইরাক শেষ পর্যন্ত চুক্তিটি বাতিল করেছে। বিগত তিন বৎসর যাবৎ এই চুক্তিটি মেনে চলার জন্য ইরানকে বহু

অনুরোধ জানানোর পর এবং শান্তিপূর্ণ পর্যায়ে এ সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় না থাকার কারণে ইরাক বাধ্য হয়েই এই চুক্তি নাকচ করেছে। ইরাকের পক্ষ থেকে দৃঢ়তার সাথে এ কথা বার বার ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইরানী এলাকা দখল করা অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করার অথবা স্বীয় সীমান্ত সম্প্রসারিত করার ইরাকের কোন ইচ্ছা নাই। কিন্তু যুদ্ধ বিস্তৃতির কারণগুলি ইরান সংঘটিত করেছে এবং ইরানী এলাকায় প্রতিশোধাত্মক আক্রমণ পরিচালিত করতে ইরানী কর্তৃপক্ষই ইরাককে বাধ্য করেছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল উপসাগরীয় এলাকায় ইরাক ও বিশ্ববাসীর অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখা।

এসময়ে ইরানী প্রেসিডেন্ট বনি সদর বিভিন্ন সংঘর্ষে ইরাকের প্রাধান্যের কথা স্বীকার করেছিলেন। তবে আয়াতুল্লাহ খোমেনী আবার ইতিমধ্যেই ইরাকের বাথ পার্টির বিরুদ্ধে বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্য ইরাকী জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে বসেন।

যাহোক যে সব সংঘর্ষ চলেছিল তাতে উভয় পক্ষেরই মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী পক্ষের তেল শোধনাগারগুলি প্রথমে ধ্বংস করে দেয়া। শাতিল আরব এলাকায় নৌযুদ্ধ এই সময়ে তীব্র আকার ধারণ করে। তবে লক্ষ্যযোগ্য যে উভয় দেশের শিল্পকারখানা, বাণিজ্য বন্দর এমনকি বেসামরিক জনগণও আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহাই পান নাই।

যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদে ইরাকের পক্ষ থেকে তাব্রিজ বিমান বন্দর এবং আহওয়াজের প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করে দেয়ার কথা জানানো হয় এবং এও বলা হয় যে, খারজের তেল রক্ষণাগারসমূহে বোমা বর্ষণ করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। কাসর-এ শিরিন এবং মেহরান এলাকায় ইরাক স্বীয় নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইরাকী বাহিনী মোহাম্মারা শহরের উপকণ্ঠে উপনীত হয় এবং আরও অগ্রসর হওয়ার আগে বসরা শহরের দিকে শাতিল আরবের তীরে ইরানী বাহিনী বালুর যে প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ

করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। অচিরেই ইরাকী বাহিনী মোহাম্মারা এবং মেহরানে ইরাকী পতাকা উত্তোলন করে। তবে ইরানী বাহিনীও কির্কাক শহর, আরবিল, মসুল, আল-কুট এবং বসরা শহরে বিমান আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে।

এদিকে অর্থাৎ, ২৪শে সেপ্‌টেম্বর তারিখেই ইরাকের দেশরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আদনান খায়রাল্লাহ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, ইরাক নিজের সব এলাকা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। জেনারেল আদনান খায়রাল্লাহ বলেন : শাতিল আরব এলাকা বন্ধ ঘোষণা করায় এবং হরমুজ প্রণালীতে অপরাপর দেশের জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় ইরাক এবং বিশ্ববাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই ইরাকী বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। কারণ, আমরা জানি যে, ইউরোপ, জাপান এবং তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই এলাকা দিয়েই তাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানী সংগ্রহ করে। ইরান যদি আমাদের অধিকার স্বীকার করে নেয়, তাহলে আমরা এখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত রয়েছি। আর যদি তাতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে যতক্ষণ তারা এই ন্যায্য, দাবী-গুলি স্বীকার না করে ততক্ষণ আমরা ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে আমাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখব। শাতিল আরব এলাকায় আমরা সার্বভৌমত্বের দাবী করেছি, তবে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, নয়া এলাকা দখল করার কোন উদ্দেশ্য আমাদের নাই। ইরানী জনগণের সাথে আমাদের ভ্রাতৃসম্পর্ক রয়েছে এবং ইরানী বাহিনীর প্রতিও আমরা সশ্রদ্ধ। কারণ আমরা জানি যে, ইরানী নেতৃবৃন্দের অশুভ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যই ইরানী বাহিনীকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

শান্তি প্রচেষ্টা : ইরাকের যুদ্ধ বিরতি : ইরানের অসহযোগিতা : যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি

ইরাক ও ইরানের মধ্যকার এই ভ্রাতৃঘাতী মারাত্মক যুদ্ধের একটি

বিশেষ লক্ষণীয় দিক হল এই যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পথম দিক থেকেই যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা শুরু হয়। বস্তুতঃ বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ গ্রুপ অথবা শক্তিগুলিই এই প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু দুঃখজনক এই যে, এসব প্রচেষ্টার কোনটিই শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। যুদ্ধ বন্ধের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা আসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে। এ ছাড়াও ইসলামিক শান্তিমিশন, জোটনিরপেক্ষ গ্রুপ এবং আরো অন্যান্য দেশ ও গ্রুপের পক্ষ থেকেও যুদ্ধ অবসানের চেষ্টা চালানো হয়। নিরাপত্তা পরিষদের প্রচেষ্টাই ছিল সর্বপ্রথম। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার জন্য উভয় দেশের প্রতি আহবান জানানো হয়। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা আসে ইসলামী দেশগুলির পক্ষ থেকে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পক্ষ থেকে এ উদ্দেশ্যে একটি শুভেচ্ছা মিশন বাগদাদ ও তেহরানে প্রেরণ করা হয়। এ মিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তখন ইসলামিক কন্‌ফারেন্স সংস্থার সভাপতি পদে বরিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সাথে এ মিশনের সংগে গিয়েছিলেন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল জনাব হাবিব শাত্তি। এরপর জোট নিরপেক্ষ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য বাগদাদ ও ইরানে তদীয় বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন।

ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সাদুন হাম্মাদী এই সময়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, যুদ্ধের মূল কারণ এবং ইরাকের জাতীয় স্বার্থ ও অধিকার নির্ণয় ও নির্ধারণের জন্য যে কোন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মধ্যস্থতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইরাক সম্মত হয়েছে। ইরাকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন : ইরাক জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মৌলনীতি এবং জাতিসংঘ সনদের প্রতি উহার দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে এবং একথাও ইরাক পরিস্কার-

ভাবেই জানিয়ে দিয়েছে যে, রাজনৈতিক পন্থা নিঃশেষিত হয়ে গেলেই মাত্র ইরাক স্বীয় অধিকার রক্ষায় সামরিক শক্তির আশ্রয় নেবে। এ নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ইরাক ঘোষণা করছে যে, বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যাপারে ইরাক সর্বদাই উন্মুখ। সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা শান্তি রক্ষার ব্যাপারে অনেক দেশের উদ্বিগ্নতার বিষয়টিও ইরাক বিবেচনা করে। প্রসঙ্গতঃ এটা বলা প্রয়োজন যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বার্থ, বিশেষকরে তেল সরবরাহের প্রশ্নটি সম্পর্কে স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে ইরাক সম্পূর্ণরূপে সজাগ।

কিন্তু উল্লেখ্য যে, ইরাক ও ইরানের মধ্যকার এ সংঘর্ষ বন্ধের আন্তর্জাতিক সব প্রচেষ্টাই ইরানী প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী রাজাই নাকচ করে দেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং হাবিব শাত্তির তেহরান পেঁাছার পূর্বে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে জনাব রাজাই ঘোষণা করেন যে, "যে কোন ব্যক্তিত্বকেই অভিনন্দন জানাতে আমার দেশ প্রস্তুত রয়েছে, কিন্তু ইরান কোন শুভেচ্ছা মিশনকেই স্বাগত জানাবে না। তাছাড়া আমরা কিছুতেই একথা স্বীকার করব না যে, ইরান কোনরূপ মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী আছে।"

এই সময়ে যুদ্ধ বন্ধের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় কিছুটা স্তিমিতভাব দেখা দিলে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি পালনের জন্য উভয় দেশের প্রতি পুনরায় আবেদন জানানো হয় এবং এর জবাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি পালনের জন্য ইরাকের পক্ষ থেকে অনুকুল মনোভাব প্রদর্শিত হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের সকালে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন : সারা বিশ্বের সমীপে আমরা একথা পেশ করছি যে, অপর পক্ষ এই আন্তরিক আহবানে সাড়া দিলে ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত রয়েছে। আমাদের অধিকার রক্ষা এবং একটি সম্মানজনক সমাধানে উপনীত হওয়ার নিশ্চিয়তা পেলে ইরাক ইরানের

সাথে সরাসরি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অথবা যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সম্মত রয়েছে। আজ পর্যন্তও আমাদের সেনাবাহিনী কাসর-এ-শিরিন, মেহরান, সরবিল জাহাব, আও-য়াজ, মোহাম্মারা এবং শাতিল আরব এলাকায় বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত রয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার কারণে আমরা কোন অযৌক্তিক দাবী পেশ করতে চাই না এবং আমরা মনে করি যে, এরূপ কোন কিছু করার অধিকারও আমাদের নাই। আমরা শুধু ইরান সরকারের প্রতি আমাদের স্থল ভাগ, সমুদ্র ও নদী পথে ইরাকের স্বার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার আহবান জানাই। আমরা তিনটি দ্বীপ থেকে ইরানের বে-আইনী অধিকার প্রত্যাহার করে নিতে বলি। এ যুদ্ধ আমাদের একার নয়, সংশ্লিষ্ট এলাকায় আরবীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার প্রশ্নে সারা আরব দেশের স্বার্থ এতে বিজড়িত। উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরানের বলপূর্বক প্রবেশের বিষয়টি আমরা কিছুতেই মেনে নেব না এজন্য যে, এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বৈদেশিক অনুপ্রবেশের নিশ্চয়তা ঘটবে।

সেদিনই অপরাহ্নে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মেক্সিকো এবং নরওয়ে ছিল এ প্রস্তাবটির উদ্ভাপক। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, (১) নিরাপত্তা পরিষদ শক্তি প্রয়োগ অব্যাহত না রাখার জন্য ইরাক ও ইরানের নিকট দাবী জানায় এবং এই মর্মে উভয় দেশের প্রতি আহবান জানায় যে, ন্যায়নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় এ বিরোধের মীমাংসা করতে হবে, (২) সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য পরিষদ উভয় দেশের প্রতি আহবান জানাচ্ছে, (৩) এ যুদ্ধের বিস্তৃতির সম্ভাব্যতা পরিহারজনক কাজে মনোনিবেশ করার জন্য পরিষদ সব দেশের প্রতি আহবান জানায়, (৪) পরিষদ জাতিসংঘের সেক্রে-টারী জেনারেলের মধ্যস্থতার প্রস্তাবের প্রতিও সমর্থন জ্ঞাপন করছে এবং (৫) এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ সমীপে পেশ করার উদ্দেশ্যে ৪৮

ঘন্টার মধ্যে একটি রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য পরিষদ সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

ইরাকের রাষ্ট্রপ্রধান যখন ভাষণ দান করছিলেন, পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ও জনাব হাবিব শাত্তি তখন বাগদাদের পথে যাত্রা বিরতিতে আম্মানে ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ইতিপূর্বে তেহরানে প্রেসিডেন্ট আবুল হাসান বনি সদরের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু খোমেনী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তেহরানে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তখন বলেছিলেন যে, "ইরান এখনো এরূপ পর্যায়ে রয়েছে যেখানে মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার কোনই মূল্য নাই। বনি সদরের জনৈক অনুগামীও তখন ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের সফর ফলপ্রসূ হয় নাই। ইরাকী বাহিনীর শেষ সৈন্যটি ইরানী এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ অব্যাহত রাখব।"

এরই মধ্যে মধ্যস্থতার বিষয়ে বাগদাদে আগমনের জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ইরাকী প্রেসিডেন্টের সাথে টেলিযোগে আলাপ করলে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তাঁকে স্বীয় লক্ষ্যে বাগদাদে আগমন করার আহবান জানান এবং বলেন যে, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও ইরাক ইসলামী দেশগুলির অথবা যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা অথবা মিত্র দেশের মধ্যস্থতার প্রস্তাবে সানন্দে সাড়া দেবে।

বাগদাদ সফরকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকগুলিতে জর্দান রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আমির হাসান বিন তালালও উপস্থিত ছিলেন।

বাগদাদ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক যুক্তরাষ্ট্রের পথে প্যারিস গমন করেন। প্যারিসে তিনি প্রেসিডেন্ট জিসকার্ড দেস্তার সাথে ইরাক ইরান যুদ্ধাবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ত্যাগ

করার মুহূর্তে সাংবাদিকদের বলেন যে, বাগদাদে অনুষ্ঠিত আলোচনার ফলে ইরাক-ইরান সংঘর্ষের সমাধানের বিষয়ে তিনি প্রকৃতই আশাবাদী।

জোটনিরপেক্ষ গ্রুপের শান্তি প্রচেষ্টারও একই পরিণতি ঘটে। ২৬শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে কিউবার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাগদাদে আসার পর ইরাকের সরকারী মুখপাত্র বলেন: "চলতি সংঘর্ষ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আগত কিউবার শান্তি মিশনকে ইরাক সাদরে গ্রহণ করছে"। অথচ অপর পক্ষে ইরানী প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী রাজাই ঘোষণা করেন যে, "ইরাকী বাহিনীর ইরানে অবস্থানকাল পর্যন্ত যে কোন মধ্যস্থতার প্রস্তাবে ইরান কোনরূপ সাড়া দেবে না। অতএব কিউবার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ইরান সফর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং মোহাম্মদ আলী রাজাই মন্তব্য করেন যে, ইরাকের সাথে আলোচনা টেবিলে বসার কথা বলা হলে এটা ধরে নিতে হবে যে, ফিডেল ক্যাস্ট্রো আমাদের জনগণের বিপ্লবকে ভুল বুঝেছেন"।

ইরান যে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয়—এ বিষয়টি ইরানের মস্কোস্থ রাষ্ট্রদূতের কথায়ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। ২৯শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে মস্কোয় আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইরানী রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ মেকরী বলেন যে, ১৯৮১ সালে রাশিয়ার সাথে সম্পাদিত চুক্তিটির উপর ইরানখুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেনা। ইরাকের সাথে সমঝোতার ব্যাপারে এই সম্মেলনে তিনি কতিপয় শর্তও আরোপ করেন। শর্তগুলি ছিল ১। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের শাসনের অবসান এবং ২। ইরাকের জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কর্তৃক শাসনভার গ্রহণ ৩। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত সম্পদ প্রদান না করা পর্যন্ত ইরাকের বসরা শহরে ইরানী কর্তৃত্ব কায়েম থাকবে এবং ৪। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির পর শহরটি ইরাক অথবা ইরানের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রশ্নটি উক্ত শহরের জনগণের ভোটে মীমাংসিত হবে। রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলীতে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল যে, কুর্দিস্তানে স্বায়ত্বশাসনের

অথবা এই এলাকার ইরানী শাসন কায়েম রাখার বিষয়টিও কুর্দীদের ভোটে নির্ধারণ করতে হবে। রাষ্ট্রদূতের এ ধরনের কথাবার্তা বলা-বাহুল্য বিশ্ব জনমত কর্তৃক সমর্থিত হয় নাই।

যাহোক, ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের নিকট থেকে একটি পত্র পান। পত্রে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন যে, যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ইরাক মেনে নিতে প্রস্তুত রয়েছে যদি অপর পক্ষ থেকেও তা অনুরূপভাবে গৃহীত হয়। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন উপরোক্ত পত্রে একথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের সার্বভৌমত্ব ও অধিকারের নিশ্চয়তা সম্পন্ন যেকোন সম্মানজক সমাধানে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে আমরা যেকোন আন্তর্জাতিক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ মধ্যস্থতার সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত রয়েছি।

এবিষয়েও ইরানের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয় যে, ইরানী এলাকায় ইরাকের সেনাবাহিনী অবস্থান করা পর্যন্ত ইরান প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন মধ্যস্থতার আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণে সম্মত নয়। সেক্রেটারী জেনারেলকে প্রদত্ত ইরানী পত্রে এ কথাও উল্লেখ করা হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব এবং আপনার সুপারিশ আমাদের সরকার বিবেচনা করতে পারে না। ইরানের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই পত্রটিতে প্রেসিডেন্ট বনি সদর স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। সেদিন তারিখ ছিল ২২শে সেপ্টেম্বর। এই পত্র থেকেও যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে ইরানের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এদিকে যখন যুদ্ধ বন্ধের এই প্রচেষ্টা চলছিল, অন্যদিকে তখন বোমার আঘাতে উভয় দেশের শহর এবং তেলের খনিগুলিতে আগুন জ্বলছিল। এ সময়ে সংঘর্ষ চলছিল প্রধানতঃ তেহরান, মুসল এবং কিরকাক শহরে। সিরিয়া এবং তুরস্কের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইরাকের

তেলের পাইপলাইনগুলিও এই সময়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখনকার যুদ্ধের মারাত্মক সংঘর্ষটি ঘটে ২৭শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে। এই সংঘর্ষ ঘটে আরবিস্তানের রাজধানী আহওয়াজের উপকণ্ঠে এবং মোহাম্মারার কতিপয় এলাকায়। একই দিনে ইরাকী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যে বুলেটিনটি প্রকাশ করা হয় তাতে বলা হয়েছিল :

আপনাদের মহান সেনাবাহিনী আহওয়াজে এসে পৌঁছেছে। সেনাবাহিনী এখন বনিকার, বনিতরফ, কিনামা, বলিলাম, তামিম, মালেক, সাবারী, সালামত, আল-মোহায়সীন শহর এবং মওশাবীয়া উপজাতীয় ভাইদের সাথে রয়েছে। আপনারা সকলেই এখন আপনাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীর হেফাজতে রয়েছেন। অতএব আমাদের মহান সেনাবাহিনী তাদের নেতৃবৃন্দের নির্দেশ কার্যকরী করেছেন এবং বিজয়কে সুদৃঢ় করাই এখন তাদের কর্তব্য।

এই সময়ে ইরানী বেতার থেকে জনগণকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আয়াতুল্লাহ খোমেনীকেও আবেদন জানাতে শোনা যায়। খোমেনী ঘোষণা করেন যে, শেষ সৈন্যটি জীবিত থাকা পর্যন্ত ইরান যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। জনগণকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য সম্ভবতঃ এটাই ছিল খোমেনীর প্রথম আবেদন। এই আবেদন থেকে অবশ্য এটাও উপলব্ধি করা যায় যে, ইরাকী সৈন্যরা প্রকৃতই ইরানের অনেক অভ্যন্তরে এগিয়ে গিয়েছিল।

৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাগদাদ শহর থেকে ঘন কাল ধোঁয়া আকাশে উঠে যেতে দেখা যায়। এটা ছিল দাওয়া-তে অবস্থিত ইরাকী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বোমা বর্ষণের ফল। এই আক্রমণে প্রকল্পের জন্য তেল সরবরাহ ব্যবস্থায় আগুন ধরে যায়। একই সময়ে বাগদাদের পূর্ব দিকস্থ ইলেকট্রনিক শিল্পটিতেও একটি ফ্যানটম বিমান অনবরত বোমা বর্ষণ করতে থাকে। এটা আসলে ছিল ফ্রান্স ও ইরাকের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র।

পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের উপর এই আক্রমণে প্রকৃতপক্ষে কে অংশগ্রহণ করেছিল এ বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে জানা সম্ভব হয় নাই। কারণ, তেহরান বেতার থেকে এই আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে শেষ পর্যন্ত এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসরাঈলী বিমান বাহিনী এই আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। এবিষয়ে তখন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন মন্তব্য করেছিলেন যে, আমাদের হাতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা আমরা এই মুহূর্তে প্রকাশ করতে চাই না, তবে একটি বিষয় আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, ইরানীরা যে ধরনের বিমান ব্যবহার করেছে তা ইসরাঈলের হাতে আছে। আমরা এই আক্রমণে ব্যবহৃত কতিপয় বিমান গুলী করে ভূপাতিত করেছি। এই বিমানগুলির পাইলটগণ এই আক্রমণে ইরানের অংশ গ্রহণের কথা অস্বীকার করেছেন। ভূপাতিত বিমানগুলির মধ্যে এরূপ বিমানও রয়েছে যাদের চালকদের ব্যাপারে আমরা কোন মন্তব্য করতে চাই না, যেহেতু তারা মৃত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইরাক এবং ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে এই পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী প্রয়োজনে নির্মিত বলে বার বার ঘোষণা করা সত্ত্বেও ইসরাঈল এই কেন্দ্রটির বিষয়ে বহু বার তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। অথচ আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রটি পরিদর্শনের ব্যাপারে ইরাকের পক্ষ থেকে কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করা হয় নাই, যদিও ইসরাঈলস্থ কেন্দ্রটি ইহুদীরা কোন দিনই কমিশনের পর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত করে নাই।

যাহোক, ইরাকের পক্ষ থেকে ১লা অক্টোবর তারিখে ঘোষণা করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং হাবিব শাত্তির শুভেচ্ছা মিশনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ ৫ই থেকে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধ বিরতি পালন করবে। তবে এতে এরূপ কথা বলা হয়েছিল যে, যুদ্ধ

বিরতির পূর্বাহ্নে নিম্নলিখিত শর্তাবলী বাস্তবায়িত করতে হবে: ১। ইরানীরা ইরাকী বাহিনীর উপর আক্রমণ বন্ধ রাখবে, ২। সৈন্য চলাচল ও সমাবেশ বন্ধ থাকবে এবং ৩। ইরাকের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বিমান অথবা ক্ষতিকর প্রচারণা চালানো যাবে না।

২রা অক্টোবর তারিখে ইরাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ইরাকী বাহিনী অতঃপর সদ্য দখলীকৃত এলাকাগুলিতে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে মাত্র আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধনীতি চালিয়ে যাবে, অথচ ইরানী বাহিনী তখনও সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে চলেছে। এই সময়ে আরবিস্তান এলাকায়, বিশেষ করে মোহাম্মারাহ এলাকায় তীব্র লড়াই চলে। দেজফুল, আহওয়াজ এবং আবাদান এলাকাতেও এর অন্যথা হয় নাই। এই সময়েই জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানী চার্জ দ্য এফেয়ার্স ঘোষণা করেছিলেন যে, ইরাকের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধ করার যত প্রস্তাবই আসুক যুদ্ধপূর্ববর্তী ইরান কর্তৃক দখলকৃত এলাকাগুলি পুনরায় দখল না করা পর্যন্ত ইরান যুদ্ধ বিরতির কোন প্রস্তাব মেনে নেবে না। এর ফলে বাধ্য হয়েই ইরাককেও আক্রমণ জোরদার করতে হয় এবং ৩রা অকটোবর তারিখে ইরাকী বাহিনী ইরানের শহরগুলির সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইরাকের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে যুদ্ধ বিরতির যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, তাতে ৫ই অকটোবরকে যুদ্ধ বিরতি শুরু করার দিন হিসাবে ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু ৪ঠা অকটোবর তারিখেই চারিটি ইরানী বোমারু বিমান বাগদাদের উপকণ্ঠের বাণিজ্যিক ও বেসামরিক এলাকাসমূহে বেপরোয়াভাবে বোমা বর্ষণ করে এবং এর পর পরই ইরাকের পক্ষ থেকে পুনরায় ঘোষণা করা হয় যে, বিজয় লাভের জন্য যতদিন এবং যে কোন স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন হয় ইরাক তাতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ ইরানের এই কার্যাবলীতে

আপোষ মধ্যস্থতা ও যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাবের প্রতি ইরানের মনোভাবের বিষয়ে ইরাক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বলেই মনে হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে এর পর থেকে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করে। এই সময়ে ইরাকের বিপ্লবী কমাণ্ড কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ইসলামী এবং মিত্রদেশগুলির শুভেচ্ছার প্রতি ইরানের বিদ্বেষ-প্রসূত মনোভাব ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব খোমেনী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ইরান কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামী দেশগুলির তথা সারা বিশ্বের প্রচেষ্টার সাথে সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। একারণেই ইরাকের প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত পূর্ববর্তী ঘোষণা কার্যকর করার নির্দেশ জারী করা হয়েছে এবং ১৯৮০ সালের ৫ই অক্‌টোবর সকাল থেকে তা কার্যকরী করা হয়েছে। কিন্তু ইরানের পক্ষ থেকে এই মনোভাবকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। তাই ৫ই অক্‌টোবর তারীখেও ইরানীরা আমাদের সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং ইরাকী বেসামরিক এলাকাগুলিতে পর্যন্ত বোমাবর্ষণ করেছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত প্রস্তাব কার্যকর করে ইরাকের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর নিকট এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইরাক কথায় ও কাজে একই নীতি অনুসরণ করছে, ইরাক আন্তরিকভাবেই যুদ্ধ বিরতি কামনা করে এবং ইরাক নিশ্চিতভাবে এই সংঘর্ষের কারণ-সমূহের ন্যায্য সমাধান চায়। প্রসঙ্গতঃ ইরাকের প্রেসিডেন্টর ১৯৮০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারীখে প্রদত্ত ভাষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উক্ত ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, অপর পক্ষ থেকে অনু-

রূপ সাড়া পাওয়া গেলে ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত রয়েছে। তাছাড়া সম্মানজনকভাবে অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে আমাদের দেশ একটি ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার জন্য ইরানের সাথে আলোচনায় বসতেও রাজী আছে। আমাদের প্রেসিডেন্ট যা বলেছিলেন তার মূল কথা হল এই যে, আইনগত ও বাস্তবতার দিক থেকে ইরাকের স্থল ও নৌভাগে ইরাকের সার্বভোমত্বের বিষয়টি ইরানকে মেনে নিতে হবে, তাদের সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী হতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণমূলক মনোভাব ত্যাগ করতে হবে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নীতি ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া ইরাকী এলাকার ব্যাপারে ইরান সরকারকে পরিচ্ছন্ন মনোভাব নিয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে। ইরাকী জনগণ এবং আরবদের অধিকারের ব্যাপারে তাদের মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে। তবে এটা লক্ষ্যযোগ্য যে, ইরানী কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে আমাদের বহু কথিত উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে যে, সম্প্রসারণবাদীরা বিশ্ববাসীর প্রতি যতটুকু ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করে নিজেদের জনগণের প্রতিও তাদের দায়িত্বহীনতা ততটুকুই প্রকাশ পায়। অতএব আমরা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করি না যে, আইন ও বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধসম্পন্ন করে তুলতে হলে তাদের প্রতি চরম আঘাত হানার প্রয়োজন রয়েছে। এমতাবস্থায় এই এলাকার প্রতি নিজেদের দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে এবং সব শুভেচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজেদের আইনানুগ ঐতিহাসিক অধিকার বজায় রাখার উদ্দেশে ইরাক এই মহান সংঘর্ষ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট বনি সদর এই সময়ে স্বীয় ভাষণে যে মন্তব্য করেন প্রাসঙ্গিকভাবে তারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। স্বীয় ভাষণে তিনি

আন্তর্জাতিক সমাজ থেকে ইরানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রেসিডেন্ট বনি সদর বলেন : "সারা বিশ্বে আমাদের ব্যাপারে যা বলা হচ্ছে তা উপেক্ষা করা আমাদের উচিত নয়। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এই কারণে যে, আন্তর্জাতিক জনমত আমাদের কার্যাবলীকে ভ্রান্ত বলে মনে করছে।" এই অবস্থায় ইরানের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ, নেতৃত্বের কোন্দল এবং নেতৃবৃন্দের কথা ও কাজের অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের এই উক্তি যথেষ্ট হিসাবে বিবেচনাযোগ্য বলেই মনে হয়।

ইরানের এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের প্রেক্ষিতে ইরাকের পক্ষ থেকে বহির্বিশ্বে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করা হয় যা ইরাকীদের আন্তরিকতা ও ঐক্যবদ্ধতার কারণে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইরাকের মতামত এবং যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক কার্যাবলীর বিবরণ দান করে বিভিন্ন ভাষায় এই সময়ে ইরাকী প্রেসিডেন্টের পত্র বিশ্বের ২৭ জন রাষ্ট্রনায়কের নিকট প্রেরণ করা হয়। বিপ্লবী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের সদস্য এবং জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট জনাব নাঈম হাদ্দাদ বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানী এবং হাঙ্গেরী সফর করেন। বিপ্লবী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের সদস্য এবং আঞ্চলিক শাসন সংক্রান্ত দফতরের মন্ত্রী জনাব আবদুল ফাতাহ মোহাম্মদ আমিন ইসালী অস্টিয়া, পশ্চিম জার্মানী, স্পেন এবং সুইডেন সফর করেন। উচ্চতর শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দফতরের মন্ত্রী জনাব কাসেম মোহাম্মদ খালাফ ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, চীন ও জাপান সফর করেন। প্রতিমন্ত্রী জনাব হাসেম হাসান আকরাভী নাইজিরিয়া, সেনেগাল, মালি মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক, তাঞ্জানিয়া, জাম্বিয়া এবং কেনিয়া সফর করেন। যুবমন্ত্রী জনাব করীম মাহমুদ হোসেন তুরস্ক এবং গ্রীসের কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিপ্লবী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের সদস্য জনাব হিকমত ইবরাহীম বেলগ্রেড যান এবং কৃষিমন্ত্রী জনাব আবদুল ওহাব মাহমুদ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে গমন করেন।

একদিকে যখন এই ঘটনাগুলি ঘটে চলেছিল অপরদিকে তখন মোহাম্মারাহ শহরটির দখল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার সময়ই ইরাকী বাহিনীর একটি অংশ আল-আহওয়াজের পথে অগ্রসর হয়েছিল। তখনকার যুদ্ধের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইরাকী বাহিনী এই অভিযানে কারুন নদীর তীর থেকে আল-মোহাম্মারাহআহওয়াজ পথটি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। শাতিল আরবের সাথে মিলিত হওয়ার আগে এই নদীটি মোহাম্মারার দক্ষিণ অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ, আবাদান দ্বীপের এটাই উত্তর সীমা।

১০ই অক্‌টোবরের রাতে ইরাকী বাহিনীর ট্যাংকগুলি এ পথে অগ্রসর হয়েছিল এবং কারুন নদীর তীরে না পেঁছা পর্যন্ত তাদের এ অগ্রযাত্রা স্তব্ধ হয় নাই। সূর্যোদয়ের আগেই ট্যাংকগুলি যাতে নদীর অপর পাড়ে শত্রুর উদ্দেশে লুকিয়ে থাকতে পারে, সেজন্য নদীর উপর ৩১০ গজ লম্বা ভাসমান সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। এই সেতুটি ছিল ইরাকী বাহিনীর প্রযুক্তিগত দক্ষতার এক অদ্ভুত নিদর্শন। প্রত্যুষে ইরাকী সৈন্যরা ইরানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হতচকিত ইরানী সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে দিয়ে বিপুল সংখ্যক ইরানীকে বন্দী করে এবং বৃটেন ও আমেরিকায় তৈরী কামান, বন্দুক ও ট্যাংক দখল করে নেয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা সত্ত্বেও শেষের দিকের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা সৈনিক, সাংবাদিক ও সাধারণ দর্শক নির্বিশেষে সবাইকে বেশ পুলকিত করেছিল। এটা ছিল পরাজিত ইরানী সৈন্য ও ট্যাংক বহরকে মাল-টানার কাজে ব্যবহারের ঘটনা। ইরাকীরা দখল করা গোলা-বারুদ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ইরানী সৈন্যদের কাঁধে বোঝাই করে তাদের বসরার দিকে ডবল মার্চ করিয়ে নিয়ে যায়।

এই যুদ্ধে ইরানী বাহিনী বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ইরাকীরা এসব অস্ত্র চালনায় দক্ষ ছিল বলে এরা এগুলি পরবর্তী যুদ্ধে

ব্যবহার করেছে। তাছাড়া জাগুয়া পার্কে এগুলি দিয়ে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় এবং জর্দানী বাহিনীর জন্য ৫০টি ট্যাঙ্ক দিয়ে দেয়া হয়।

কারুন নদী অতিক্রম করার ফলে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে আবাদান দ্বীপটিকে ঘিরে ফেলা ইরাকীদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠে এবং তারা ইরানের অপরাপর এলাকা থেকে আবাদান তেল শোধনাগারের সাথে সংযুক্ত রাস্তাগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দখল করে নেয়।

এই এলাকার যুদ্ধেই ইরাকীরা ইরানের তেলমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ জাওয়াদ তান্দকুয়ানকে বন্দী করেছিল এবং আবাদান তেল শোধনাগার ও আহওয়াজের মধ্যবর্তী তেলের পাইপ লাইন ধ্বংস করে দিয়েছিল।

মোহাম্মারাহ শহরটি দখলের বিষয়ে কিছুটা মতদ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায়। তবে তা, শুধুমাত্র দিন তারীখের কথা। অবশ্য এরূপ মতদ্বৈধতার অবকাশও রয়েছে, কারণ শহরটির অবস্থান এরূপ বিচিত্র যে, একদিনে অথবা একক কোন ঘটনায় এই শহরটি দখল করার কোন সুযোগই নাই।

মোহাম্মারাহ শহরটিকে অবস্থান বৈচিত্র্যের দিক থেকে মোটামুটি-ভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর প্রথমটি হল বন্দর এলাকা যা শাতিল আরবের সাথে যুক্ত, দ্বিতীয়টি হল পুরাতন শহরের উত্তরাংশ, তৃতীয়টি পূর্বাঞ্চলের নয়া শহর; চতুর্থটি হল কারুন নদীর অপরাংশ এবং অবশিষ্টটি হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামরিক এলাকা। বস্তুতঃ বিশেষ করে এজন্যই কয়েকটি পর্যায়ে এ শহরটির পতন ঘটেছিল।

আল-মোহাম্মারার প্রথম পর্যায়ের পতন ঘটেছিল বন্দরের দিক থেকে এবং সর্বশেষ যুদ্ধ হয় কারুন নদী অতিক্রম করার পর। শেষের দিকের যুদ্ধটি ছিল মারাত্মক ধরনের ভয়াবহ। প্রতিটি রাস্তায় এবং প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন একবার বলেছিলেন : "আমার সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা, আল-মোহাম্মারায় শত্রুদের পরাজিত করে আপনারা যতটুকু ভূখণ্ড যুক্ত করেছেন তার প্রতিটি ইঞ্চির জন্য

আপনারা নিজেদের রক্তে মূল্য পরিশোধ করেছেন। আপনাদের এই ত্যাগ ইতিহাসের পাতায় একটি নয়া অধ্যায় সংযোজন করেছে। আপনাদের এই প্রচেষ্টা আরবদের নয়া চেতনার উদ্বোধন।"

বাগদাদ থেকে প্রকাশিত ৮ই নবেম্বর তারীখের পত্রিকাগুলিতে এই যুদ্ধকে চরম বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়। এদিন থেকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ইরাকী বাহিনীকে শত্রুদের অস্ত্র-শস্ত্র সরিয়ে নেয়া ও শহরটির পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

উপসংহার

যাহোক, মোট কথা হল যে, ইরাক ও ইরানের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ প্রায় তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল, এখনো তা বন্ধ হয় নাই ; আজও তা চলছে। এ যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন, ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা এবং আরো অনেক প্রভাবশালী রাষ্ট্র ও বিশ্ববরেণ্য নেতা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হয় নাই, যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। ইরাক ও ইরানের নওজোয়ানদের রক্তে আজও মরুভূমির বালুকারাশি লাল হয়ে চলেছে।

বিগত তিন বছরের যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ দেয়া আমাদের এ লেখার উদ্দেশ্য নয় এবং তা সম্ভবও নয়। আমরা যা চেয়েছি তা হল, কারণ বিশ্লেষণসহ সাম্প্রতিককালের সর্বাধিক ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পাঠককে একটি সার্বিক ধারণা দিতে, যাতে এ সম্পর্কে একটি যথাযথ ধারণা নেয়া সহজ ও সম্ভব হয়।

আমাদের এ আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ থেকে একটি বিষয় বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইরাক-ইরানের মতবিরোধ ও সংঘর্ষের মূল কারণ সুদূর অতীতে নিহিত রয়েছে। এমন কি এর উৎস খুঁজে পেতে হলে প্রাক-ইসলামিক যুগের ঘটনাবলীর দিকেও নজর দিতে

হয়। আরব ও ইরানীদের এই মতবিরোধ অথবা সংঘর্ষ বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে একথা সত্য, কিন্তু এই বিরোধ যে ইরাক ও ইরানবাসীর ঐতিহ্যগত একথাও অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমাদের বর্তমান তথ্য-ভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষিতে, এমতাবস্থায় আমরা এ নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে—

(১) ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, জাতীয়তা এবং সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকের বিবেচনায় আরবিস্তানসহ শাতিল আরব ও বিরোধীয় সারা এলাকাই প্রকৃতপক্ষে আরব ভূমি এবং এই এলাকার আরবীয় চরিত্র ইতিহাসে উল্লেখিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বীকৃত হয়েছে।

(২) এই এলাকার ইতিহাস এবং ইরাক তথা আরব জাতির ইতিহাস ঐক্য সূত্রে গ্রথিত। যেমন, জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক উইলসন বলেছেন যে, ইরান থেকে বিরোধীয় এলাকার পার্থক্য জার্মানী ও স্পেনের পার্থক্যের মতই সুস্পষ্ট। এ কারণেই অতীতে এটা দেখা গেছে যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কারণে ইরাক থেকে বিরোধীয় এলাকার কোন অংশকে পৃথক করা হলেও উভয় এলাকার জনগণ পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা কোন কালেই অনুভব করে নাই। ইরাকের ঘটনাবলীর প্রভাব এসব অঞ্চলে সব সময় সমভাবে অনুভূত হয়েছে।

(৩) শাতিল আরবের উভয় তীরের অর্থনীতির ভিত্তি এক ও অভিন্ন। এর উভয় তীরেই রয়েছে কালো সোনার খনি, কৃষি ক্ষেত আর খেজুর গাছের সারি যে অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপীয় শক্তিগুলি অতীতে ইরাকসহ সারা এলাকায় একক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে।

(৪) ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সর্ব পর্যায়ে এই সংশ্লিষ্ট এলাকার অভিন্নতা রয়েছে এবং নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও ইরানীরা আরব উপদ্বীপের জনগণ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

(৫) ইতিহাসের শিক্ষা এটাই যে, ইরানীরা সব সময় উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে এসেছে। ইরানীরা আরবদের ঘৃণা করে এবং আরব শক্তিকে ধ্বংস করতে তারা সতত সচেষ্ট। তাছাড়া ইরানীরা একমাত্র নিজেদের ছাড়া বিশ্বের অপর কোন দেশ অথবা জাতির প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করতে জানে না।

(৬) ইরাকের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খোমেনীর হস্তক্ষেপের চেষ্টা এবং ইরাকী এলাকায় ইরানের প্রথম আক্রমণ থেকেই বর্তমান ইরাক-ইরানের যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। এর প্রত্যুত্তর দিয়ে ইরাক শুধুমাত্র নিজের আত্মরক্ষার অধিকারই প্রয়োগ করেছে।

(৭) শাহের বিরোধিতায় খোমেনী ইরানী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়েছেন, কিন্তু ইরানী জনগণের মনঃপূত না হওয়ায় অর্থাৎ, অন্যায় ও অসঙ্গতভাবে ইরাক আক্রমণ করায় খোমেনী এব্যাপারে ইরানী জনগণের অভিন্ন সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছেন।

(৮) ইরানী নেতারা ইরাকেও নিজেদের দেশের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইরাকী জনগণ ও নেতৃত্বের ঐক্য ও দৃঢ়তা তাদের হতাশ করেছে।

(৯) ইরাক ও ইরানের যুদ্ধকে এক্ষণে কেবল মাত্র দুই প্রতিবেশী দেশের যুদ্ধ হিসাবেই চিহ্নিত করা যায় না, এ যুদ্ধ আরব ও ইরানী এই দুই জাতির যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ইরাক ও ইরানের বর্তমান যুদ্ধ বস্তুতঃ সারা মধ্যপ্রাচ্যকেই এখন ইতিহাসের এক নয়া অধ্যায়ের দিকে পরিচালিত করছে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্য এখন এসে পৌঁছেছে ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ যে আন্তঃআরব সম্পর্ক এবং আরব বহির্বিশ্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সৃষ্টি করবে ইতিহাসই হবে তার সর্বোত্তম সাক্ষী।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

১৯১৩ সালের ৪ঠা (১৭) নভেম্বর স্বাক্ষরিত তুরস্ক ও পারসিক সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত কন্সটাণ্টিনোপল চুক্তি

তুরস্ক ও পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির মধ্যে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মতৈক্যগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য তুরস্কের মহামান্য সুলতানের দরবারে প্রেরিত বৃটেনের বিশেষ দূত মাননীয় স্যার লুই মলেট মহামান্য সুলতানের দরবারে প্রেরিত পারস্যের শাহান শাহের রাষ্ট্রদূত মাননীয় মির্জ্জা মাহমুদ খান খাজর, মহামান্য সুলতানের দরবারে রুশ সম্রাটের প্রেরিত বিশেষ দূত মাননীয় এম, মাইকেল ডি জিয়ার্স এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় উজির প্রিন্স সাঈদ হালীম পাশা এই বৈঠকে মিলিত হন।

উভয় সাম্রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে অদ্যাবধি নিজেদের মধ্যে যেসব মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি স্মরণ রেখে এই মাননীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁদের কাজ শুরু করেন।

তুরস্ক ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে ইতিপূর্বে তেহরানে স্বাক্ষরিত প্রটোকলের ১ নং ধারা অনুসারে গঠিত সীমানা নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত যুক্ত কমিশন সর্বমোট ১৮ টি বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকগুলির প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালের ১২ই মার্চ তারীখে এবং সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালের ৯ই আগষ্ট তারীখে।

কন্সটাণ্টিনোপলে প্রেরিত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত তুরস্কের মহামান্য সুলতানের নিকট ১৯১২ সালের ৯ই আগষ্ট তারীখে প্রেরিত ২৬৪ নং

পত্রে উল্লেখ করেন যে, ইরজেরোমের চুক্তি, যা প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৮ সালের স্থিতাবস্থার নামান্তর, দ্রুত কার্যকর করার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এখন ঠিক হবেনা বলে রাশিয়ার সম্রাট মনে করেন। এই সাথে রাষ্ট্রদূত মহামান্য সুলতানের নিকট একটি স্মারক চিত্রও পাঠিয়েছিলেন যাতে বর্তমানে বলবত চুক্তিগুলির ভিত্তিতে বিস্তারিতভাবে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছিল।

তুরস্কের সুলতানের পক্ষ থেকে ১৯১৩ সালের ১৮ই মার্চ তারীখে প্রদত্ত ৩০৪৬৯/৪৭ নং পত্রে এর জবাব দেয়া হয়। জবাবে বলা হয় তুরস্কের মহামান্য সুলতান রাশিয়ার সম্রাটের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এবং উভয় দেশের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ থাকলে উহা নিরসন করার জন্য এবং তুরস্ক ও পারস্যের সাথে সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা দূরীভূত করার জন্য রাশিয়ার মাননীয় রাষ্ট্রদূতের দেয়া সীমানা চিহ্নিতকরণ স্মারকলিপি গ্রহণ করতে সম্মত রয়েছেন যা সর্দার বুলক থেকে বেন অর্থাৎ ৩৬ অক্ষাংশের সমান্তরালে তুরস্ক ও পারস্যের সীমানা নির্দিষ্ট করবে।

এই জবাবে অবশ্য রাষ্ট্রদূতের দেয়া স্মারক লিপির বিষয়ে কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। তাছাড়া এই জবাবে জোহাব সীমান্তের বিষয়ে একটি বিস্তারিত ব্যাখাসহ পারস্যের সাথে সীমানার বিষয়ে তুরস্কের গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়।

১৯১৩ সালের ২৮শে মার্চ তারীখে প্রদত্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের ৭৮ নং পত্রে এ বিষয়ে লেখা হয় যে, 'এটা এখন বুঝা যায় ৯ই আগষ্ট তারীখের পত্রের মর্মানুযায়ী সুলতানের নিকট থেকে প্রাপ্ত জবাব ১৮৪৮ সালের চুক্তির ৩নং ধারা মোতাবেক আরাত বেন এলাকার সীমা নির্দ্ধারণের বিষয়ে সম্মতি সূচক।" তাছাড়া এই পত্রে সোপারেশকৃত সীমানা চিহ্নের বিষয়ও তুরস্কের চুক্তি যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করা হয়।

১৯১৩ সালের ২০শে এপ্রিল তারীখে বৃটিশ ও রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতগণ যুক্তভাবে একই কথা মহামান্য সুলতানের নিকট লিখে পাঠান। এই পত্রটি

প্রেরিত হয়েছিল মাননীয় প্রিন্স সাঈদ হালীম পাশার নিকট। এই সব চিঠিপত্রের ভিত্তিতে এক পক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রদূত এম, মাইকেল ডি-জিয়ার্স ও স্যার জিরর্ড লুথার ও অন্যপক্ষে মাননীয় মাহমুদ শেফকাত পাশার মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের ফলাফল আবার স্মরণিকার আকারে বৃটিশ ও রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের নিকটও দেয়া হয়েছিল।

তুরস্ক ও পারস্যের দক্ষিণ সীমান্ত নির্দ্ধারণের বিষয়ে এর পর পরই অর্থাৎ, ২৯শে জুলাই তারীখে স্যার এডওয়ার্ড গ্রে এবং ইব্রাহীম হাক্কী পাশার মধ্যে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আলোচনার ভিত্তিতে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় এবং এসবের ভিত্তিতে অতঃপর রুশ রাষ্ট্রদূত তুরস্ক ও পারস্যের সীমানা নির্দ্ধারণের বিষয় কতিপয় মৌলিক নীতি প্রণয়ন করেন। ৫ই আগষ্টের ১৬৬ নং নোটে রাষ্ট্রদূত কর্তৃক এই নীতিমালা সুলতানকে জানিয়ে দেয়া হয়। মহামান্য সুলতান ২৩শে সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত স্বীয় জবাবে এগুলি স্বীকার করে নেন।

এর ফলাফল হিসাবে বৃটেন, পারস্য, রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সীমানা নির্দ্ধারণের বিষয়ে আরো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সরকারী প্রতিনিধি-বৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদিতে সম্মত হন।

তুরস্ক ও পারস্যের সীমানার সংজ্ঞা নিম্নবর্ণিতরূপে নির্দ্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছোট ও বড় আরারাতের মধ্যবর্তী সরদার বুলাকের সন্নিকটে অবস্থিত তুরস্কও রাশিয়ার সীমান্তে ৩৭ নং সীমান্ত চিহ্ন থেকে উত্তর সীমানা নির্দ্ধারণের কাজ শুরু হবে। পর্বতমালার কাছে গিয়ে এটা কিছুটা দক্ষিণের দিকে সরে যাবে যাতে দামবাত, সারওয়াক এবং ইয়ারাইম কায়ার পানি প্রবাহের ব্যবস্থাবলী পারস্যের অংশে পড়ে।

এরপর পারস্যের বুলাকবাসী থেকে সুউচ্চ পর্বতমালার দিকে সীমানা অগ্রসর হবে যা ৪৪ ডিগ্রী ২২ শতাংশ দ্রাঘিমাংশে ও ৩৯ ডিগ্রী ২৮

শতাংশ অক্ষাংশে পড়ে। ইয়ারাইম কায়া'র পশ্চিমাংশের জলাভূমির পশ্চিম এলাকা দিয়ে অতঃপর সারিমু নদী অতিক্রম করে সীমানা গীদে বারাম এবং বহিজারগাম গ্রাম দু'টির মাঝ দিয়ে সারানলী, জেন্দুলী, গির কেলাইম, কামলী বাবা, গিদুকী, খমিনেদ ও দেবজী পর্বতমালার জলা-ভূমি অতিক্রম করবে। দেবজী পর্বতমালা থেকে চলতি পরিস্থিতি অনুসারে সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন নাদো এবং নিকতো গ্রাম দু'টি পারস্যকে নিয়ে সীমানা নির্ধারণের কাজ চালিয়ে যাবে।

কাইজাইলকায়া গ্রামটির মালিকানা উহার ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করবে। তবে, ইহার জলাভূমির পশ্চিমাংশ তুরস্ককে এবং পূর্বাংশ পারস্যকে দেয়া হল।

সীমানা যদি তুরস্কের এলাকা ছেড়ে কাইজাইলকায়ার সমীপবর্তী রাস্তা ধরে বাইজাইদকে ভেন প্রদেশের সাথে যুক্ত করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, পারস্য সরকার এই সব পথে সেনা চলাচল ব্যতীত অন্যান্য কাজে তুরস্কের চলাফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। সীমানা এর পর আরবিস্তানের জলাভূমির দিকে চলে যাবে।

সান্দালী ও উত্তরাংশের পয়েন্টের সীমান্ত লাইন সম্পর্কে মাননীয় হাক্কী পাশা ও স্যার গ্রে'র মধ্যে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই আলোচনার ভিত্তিতে সীমানা কমিশন স্বীয় কর্তব্য সমাধা করবেন।

সমুদ্র এলাকা পর্যন্ত হাওয়াইজাহ অঞ্চলের সীমানা নির্দ্ধারণের কাজটি উমশির থেকে শুরু করা হবে যা বাসেতিন থেকে ৯ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত

উমশির থেকে সীমানা ৪৫ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলে যাবে। এই পয়েন্ট থেকে সীমানা দক্ষিণ দিকে চলে গিয়ে ৩৩ অক্ষাংশে পেঁছবে এবং অতঃপর উহা কুশক-ই-বসরাতে গিয়ে মিলিত হবে এবং তা এরূপ হবে যাতে কুশক-ই-বসরা তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশে পড়ে।

এখান থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে সীমানা খায়ইন ক্যানেল ধরে নহ-রাই-নরজালেহ-এর মুখ পর্যন্ত শাতিল আরবে গিয়ে মিলিত হবে। এর পর সমুদ্র পর্যন্ত সীমানা শাতিল আরব ধরে এগিয়ে যাবে। তবে, নিম্ন-বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে শাতিল আরব ও উহার সবগুলি দ্বীপে তুর্কী সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকেবে।

(১) পারস্যের অন্তর্গত থাকবে :

(ক) মুহাল্লা এবং শাতিল আরবের বাম তীরবর্তী দু'টি দ্বীপ।

(খ) শেতাইত ও মাবিয়ার মধ্যবর্তী চারটি দ্বীপ এবং মানকুহী'র বিপরীত দিকস্থ দু'টি দ্বীপ।

(গ) আবাদানের সন্নিকটে অবস্থিত অথবা ভবিষ্যতে গড়ে উঠতে পারে এরূপ যে কোন ক্ষুদ্র দ্বীপ।

(২) মোহাম্মারার আধুনিক বন্দর ও নোঙ্গর এলাকা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু এর ফলে তুর্কীদের এই এলাকা ব্যবহারের অধিকার ক্ষুন্ন হবেনা।

(৩) পারস্যের এলাকাভুক্ত শাতিল আরবের তীরে মাছ ধরার ব্যাপারে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মরীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

(৪) জোয়ারের ফলে পারস্যের কোন এলাকা পানির আওতায় এসে গেলে তুর্কীরা সে অংশ দাবী করতে পারবেনা।

(৫) মোহাম্মারার শেখ তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত নিজ এলাকার উপর স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখতে পারবেন।

এভাবে যে সীমানা নির্দ্ধারণ করা হল তাছাড়া অপর কোন এলাকায় সীমা নির্দ্ধারণের প্রশ্ন অবশিষ্ট রয়ে গেলে সে এলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে।

সংশ্লিষ্ট চারটি সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সীমানা চিহ্নিতকারী কমিশন সরেজমিনে সীমানা চিহ্নিত করার

কাজ সমাধা করবেন। প্রতিটি সরকারের পক্ষ থেকে এই কমিশনে এক-জন কমিশনার ও একজন সহকারী কমিশনার কাজ করবেন। প্রয়োজন-বোধে সহকারী কমিশনার কমিশনারের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

এভাবে সীমানা চিহ্নিত করার কাজে কমিশনের সদস্যেদর মধ্যে কোন মতপার্থক্য দেখা দিলে তুরস্ক ও পারস্যের কমিশনারদ্বয় পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের মতামত লিপিবদ্ধ করে বৃটিশ ও সোভিয়েট কমিশনারদের নিকট পেশ করবেন এবং পরবর্তী কমিশনারগণ এই বিষয়ে গোপন আলোচনার পর পূর্ববর্তী কমিশনারগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন এবং এই সিদ্ধান্ত অতঃপর সংশ্লিষ্ট চারটি সরকরের জন্যই বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচিত হবে।

এভাবে একবার কোন এলাকার সীমানা চিহ্নিত হওয়ার পর বিষয়টি দ্বিতীয় দফা বিবেচিত হবেনা। তাছাড়া তুর্কী ও পারস্য সরকার ইচ্ছা করলে চিহ্নিত সীমানায় পোষ্ট গেড়ে দিতে পারবেন।

লুই মলেট

এহতেশামুস সুলতানেহ মাহমুদ

মাইকেল ডি জিয়ার্স

সাঈদ হালীম

১৯৩৭ সালের ৪ঠা জুলাই তেহরানে স্বাক্ষরিত ইরাক-ইরান সীমান্ত চুক্তি

ইরাকের মহামান্য বাদশাহ এক পক্ষ এবং ইরানের মহামান্য শাহানশাহ অপরপক্ষ :

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সমঝোতা সুদৃঢ় করার জন্য, দুই রাষ্ট্রের সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে সুমীমাংসা করার জন্য বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে—

ইরাকের মহামান্য বাদশাহ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর নাজী-আল-আসিল,

ইরানের মহামান্য শাহানশাহ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় এনায়েতুল্লাহ সামীকে

মনোনীত করেছেন এবং তাঁরা নিম্নলিখিত বিষয়াদিতে সম্মত হয়েছেন :

ধারা—১

উভয় পক্ষ এই মর্মে সম্মত হয়েছেন যে, বর্তমান চুক্তির ২নং ধারায় বর্ণিত সংশোধনীসহ নিম্নবর্ণিত দলীলগুলি বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং উভয় পক্ষ এগুলি বাধ্যতামূলক বলে মেনে নিবে :

(ক) ১৯১৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর কন্সটান্টিনোপলে তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত সীমানা নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত প্রটোকল।

(খ) সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশনের সীমান্ত সংক্রান্ত ১৯১৪ সালের বিবরণী।

ধারা—২

সীমানা শোত্তেইত দ্বীপের শেষ পর্যন্ত গিয়ে নিম্ন জলরাশির চিহ্ন শাতিল আরবের থলওয়েগ থেকে টানা সোজা লাইনে গিয়ে

সংযুক্ত হবে এবং সেখান থেকে আবাদানের বর্তমান ১নং জেটির বিপরীত দিকের পয়েন্টে গিয়ে পৌঁছবে। এই পয়েন্ট থেকে সীমানা পুনরায় নিম্নজলরাশির চিহ্ন পর্যন্ত যাবে এবং পরবর্তীতে ১৯১৪-সালের বিবরণী মোতাবেক অগ্রসর হবে।

ধারা—৩

বর্তমাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে উভয় পক্ষ একটি কমিশন নিযুক্ত করবেন। এই কমিশন ১নং ধারার (খ)—তে বর্ণিতরূপে সীমানা চিহ্নিত করার জন্য খুঁটি স্থাপন করবেন। এই কমিশন গঠনের ব্যবস্থাবলী উভয় পক্ষের সম্মতিতে গৃহীত হবে।

ধারা—৪

উভয় রাষ্ট্রের স্থল সীমান্ত যেখানে শাতিল আরবের পানি স্পর্শ করেছে সেখান থেকে সমুদ্র পর্যন্ত শাতিল আরবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাবলী কার্যকর হবে :

(ক) উভয় দেশের বাণিজ্য জাহাজগুলির জন্য শাতিল আরব সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। জাহাজগুলি থেকে চলাচলের সুবিধার জন্য ব্যয়, চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়নমূলক ব্যয় এবং জাহাজ চলাচলের প্রয়োজনে অন্যান্য জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ মোতাবেক কর আদায় করা হবে। এই ব্যবস্থা জাহাজের মাল পরিবহণ ক্ষমতা অনুসারে প্রয়োগ করা হবে।

(খ) উভয় দেশের যুদ্ধ জাহাজ এবং অন্যান্য ধরনের জাহাজগুলি নির্দিষ্ট পথ অনুসারে শাতিল আরবে চলাচল করবে।

(গ) শাতিল আরবে সীমানা কোন সময় নিম্ন জলরাশির আবার কোন সময় মধ্য জলরাশির পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি অত্র সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন সাধন করবেনা।

ধারা—৫

উপরে বর্ণিত ৪ নং ধারা মোতাবেক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকায় শাতিল আরবের তলদেশ খনন, জাহাজ চলাচল ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কর আরোপ, চোরা-কারবার বন্ধ করা ইত্যাকার বিষয়ে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উভয় পক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ধারা—৬

বর্তমান চুক্তি যথাসম্ভব শীঘ্র বাগদাদে অনুমোদন দেয়া হবে। অনুমোদনের দিন থেকেই চুক্তিটি বলবত হবে।

এই ধারাগুলির প্রতি স্বীকৃতি দানস্বরূপ উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদ্বয় চুক্তিটিতে স্বাক্ষর দান করছেন। চুক্তিটি আরবী, ফার্সী, এবং ফরাসী ভাষায় প্রণয়ন কথা হল। এর মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে ফরাসী ভাষার বিবরণটি প্রমাণ্য বলে গৃহীত হবে।

নাজী আল আসিল
এনায়েতুল্লাহ শামী

১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চের আলজিয়ার্স ঘোষণা

আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীনের উদ্যোগে আলজিরিয়ার রাজধানীতে ওপেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়াকালে ইরানের শাহানশাহ এবং ইরাকী বিপ্লবী কমাণ্ড কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সাদ্দাম হোসেন দু'বার বৈঠকে মিলিত হয়ে উভয় দেশের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করেন। এই বৈঠকে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাকালে ইরাক ও ইরানের নেতৃদ্বয় আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সীমান্তের যথার্থতা এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি মোতাবেক উভয় দেশের সব সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মতৈক্যে উপনীন হন।

উভয় পক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে—

প্রথমত : ১৯১৩ সালের কনষ্টান্টিনোপল প্রটোকল এবং ১৯১৪ সালের সীমানা নির্ধারণ কমিশনারের বিবরণী মোতাবেক উভয় দেশের স্থল সীমানা চুড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হবে।

দ্বিতীয় : থলওয়েগ লাইন অনুসারে উভয় দেশের নদী সীমান্ত নির্ধারণ করা হবে।

তৃতীয় : উভয় দেশ যুক্ত সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করবে এবং সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চতুর্থত : উভয় পক্ষ উপরোক্ত ব্যবস্থাবলীকে সার্বিক সমাধানের পন্থা হিসাবে গণ্য করে এবং এর যে কোন বিষয় ভঙ্গ করাকে বর্তমান মতৈক্যের নীতি বিরোধী বলে মনে করে। এই প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের ব্যাপারে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট সহযোগিতা দান করবেন এবং উভয় পক্ষ আলজিরীয় প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রায়শঃ মতবিনিময় এবং ভারসাম্য রক্ষিত সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সব ধরনের মতবিরোধ দূর করে ঐতিহ্যগত প্রতিবেশী সুলভ বন্ধুত্ব রক্ষা করতে উভয় পক্ষ সম্মত রয়েছেন এবং উভয় পক্ষই এতদঅঞ্চলে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে তৎপর থাকবেন।

আলজিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তেহরানে ইরাক ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই মার্চ মিলিত হয়ে এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাকল্পে একটি যুক্ত কমিশন গঠনের ব্যাবস্থাবলী গ্রহণ করবেন। উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে আলজিরিয়াও এই যুক্ত কমিশনের কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করবে। যুক্ত কমিশনের বৈঠক তেহরান ও বাগদাদে পর পর অনুষ্ঠিত হবে।

ইরানের শাহানশাহ ইরাক সফরের জন্য মহামান্য প্রেসিডেন্ট হাসান আল বকরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এই সফরের তারীখ নির্ধারণ করা হবে। জনাব সাদ্দাম হোসেনও তেহরান সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এই সফরের তারিখও পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ করা হবে।

১৯৭৫ সালের ১৩ই জুন স্বাক্ষরিত ইরাক-ইরান রাষ্ট্রীয় সীমান্ত চুক্তি

ইরানের মহামান্য শাহান শাহ,

ইরাকী প্রজাতন্ত্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট,

১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চের আলজিরীয় ঘোষণায় ব্যক্ত নিজেদের সব সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের বিষয়ে আন্তরিক সদিচ্ছার প্রেক্ষিতে,

১৯১৩ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল প্রটোকল এবং ১৯১৪ সালের সীমানা নির্ধারণ কমিশনের বিবরণী মোতাবেক নদী ও স্থল সীমান্ত পুনঃনির্ধারণ দৃষ্টে,

যুক্ত সীমান্তের নিরাপত্তা ও পারস্পরিক বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে,

ইরাক ও ইরানী জনগণের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অভিন্নতার কারণে—

নিজেদের বন্ধুত্ব, প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং সীমান্ত স্বার্থ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে—

নিজেদের জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার তাগিদে এবং জাতিসংঘ সনদ কার্যকর করার জন্য—

বর্তমান চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তদনুযায়ী প্রতিনিধি হিসাবে,

শাহানশাহের পক্ষে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় আব্বাস আলী খালাত বারীকে এবং

ইরাকী প্রেসিডেন্টের পক্ষে : পররাষ্টমন্ত্রী মাননীয় সাদুন হাম্মাদীকে মনোনীত করেছেন। প্রতিনিধিদল নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সম্মত হয়েছেন যে—

ধারা—১

অত্র চুক্তির বিষদ বিবরণ অনুসারে ইরাক ও ইরানের পুনঃনির্ধারিত স্থল সীমান্তের বিষয়ে কোন মতভেদ নাই।

ধারা—২

শাতিল আরবে রাষ্ট্রীয় সীমানা পুনঃনির্ধারণ করণের বিষয়টি যথাযথ হয়েছে।

ধারা—৩

রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতার জন্য সীমান্ত পথে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ধারা—৪

উপরোক্ত ১নং, ২নং ও ৩নং ধারা অতঃপর চূড়ান্ত ও স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা হবে। কোন পরিস্থিতিতেই এই ধারাগুলির কোন ব্যতিক্রম করা হবে না। অতএব এইগুলির কোন একটি ব্যতিক্রম করা হলে তা আলজিরীয় চুক্তির বরখেলাফ বলে গণ্য করা হবে।

ধারা—৫

উভয় দেশের নদী ও স্থলসীমান্ত অতঃপর অলংঘনীয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

ধারা—৬

(১) অত্র চুক্তির কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তা উপরোক্ত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারার নীতি মোতাবেক মীমাংসিত হবে।

(২) এ ধরনের মতানৈক্য উভয় পক্ষ প্রথমে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন এবং তা দুই মাসের সময়সীমার মধ্যে করা হবে।

(৩) পারস্পরিক মীমাংসায় ব্যর্থ হলে বিষয়টি পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে মিমাংসা করার দায়িত্ব কোন সাধারণ মিত্র দেশের উপর অর্পণ করা হবে।

(৪) মিত্র দেশের এই প্রচেষ্টাও কোন দেশের মনঃপূত না হলে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে মীমাংসার জন্য বিষয়টি কোন তৃতীয় পক্ষের একক বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হবে।

ধারা—৭

জাতিসংঘ সনদের ১০২ নং ধারা মোতাবেক অত্র চুক্তি রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হবে।

ধারা—৮

উভয় দেশের নিজস্ব আইন মোতাবেক এই চুক্তি অনুমোদন করা হবে। চুক্তির দলিলাদী তেহরানে হস্তান্তর করা হবে এবং হস্তান্তরের দিন থেকেই চুক্তিটি কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

চুক্তিটি ১৯৭৫ সালের ১৩ই জুন বাগদাদে সম্পাদন করা হল।

আব্বাস আলী খালাতবারী — সাদুন হাম্মাদী

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী — ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের রাষ্ট্রীয় ঘোষণা

(৮ ফেব্রুয়ারী—১৯৮০)

চলতি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, এর অগ্রগতির ধারা এবং এক পক্ষে আরব সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা এবং অপর পক্ষে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আরবদেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি জাতীয় দায়িত্ব এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল নীতির প্রেক্ষিতে,

আরব দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সাথে আরব দেশগুলির প্রতিশ্রুতি হিসাবে ইরাক এই ঘোষণা জারী করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

ঘোষণার মূল বিষয় বস্তু হল :

(১) আরব দেশগুলিতে যে কোন কারণবশতঃ যে কোন ভাবে ও আকারে বিদেশী সৈন্য ও সামরিক ঘাঁটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা। কোন আরব দেশ এই মূলনীতি অনুসরণে ব্যর্থ হলে উক্ত দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করা হবে। যে কোন মূল্যে এরূপ দেশের নীতির বিরোধীতা করা হবে।

(২) কোন আরব দেশ কর্তৃক অপর একটি আরব দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ নিষিদ্ধ করা। আরব দেশগুলির মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থাপিত হলে তা আরব স্বার্থের অনুকূলে শান্তিপূর্ণ পন্থায় মীমাংসা করা হবে।

(৩) উপরোক্ত দুই নম্বর ধারার নীতি আরব রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক এবং অন্যান্য দেশের সাথে এই দেশগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আরব দেশগুলির মৌলিক স্বার্থ বিঘ্নিত না হলে এবং সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার কারণে প্রয়োজনীয় না হলে কোন বিরোধ মীমাংসায় সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করা হবে না।

(৪) কোন আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপর কোন অনারব দেশ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্টকারী কোন হুমকীর সৃষ্টি করলে

অথবা ভিন্ন কোন দেশ কর্তৃক কোন আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলে আরব রাষ্ট্রবর্গ সম্মিলিতভাবে সর্ব শক্তি নিয়োগ করে তার বিরোধীতা করবে।

(৫) আরব দেশগুলির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয় এরূপ যে কোন দেশের জন্য আরব দেশগুলির স্থল, পানি ও আকাশসীমা ব্যবহারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মান্য করা হবে।

(৬) আরব দেশগুলির স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব জড়িত না থাকলে কোন প্রকার বিরোধ অথবা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে জড়িয়ে না পড়া।

(৭) আরব ঐক্য ও সংযুক্ত আরব অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার স্বার্থে গঠনমূলক আন্তঃআরব সম্পর্ক গড়ে তোলা। এউদ্দেশ্য যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে প্রতিটি আরব রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৮) এই ঘোষণা জারী করা প্রসঙ্গে ইরাক প্রতিটি আরব রাষ্ট্রের বিষয়ে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্র ঘোষণার বিষয়াবলী অনুমোদন করছে।

এই ঘোষণা কিছুতেই আরব লীগ সনদ এবং সংযুক্ত আরব দেশরক্ষা ও সহযোগিতা চুক্তির ধারাগুলিকে অকেজো করবে না। অত্র ঘোষণা উক্ত সনদ ও চুক্তির ধারাগুলির সহায়ক হবে বলে ইরাক মনে করে।

ইরাকের মহান জনগণ!

আরব জাতির মহান জনতা!

সর্বপ্রকার আঞ্চলিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এবং জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইরাক এই ঘোষণা জারী করেছে। এই ঘোষণা আরব ঐক্য ও আরব জাতির-আশা আকাঙ্খা রূপায়নে মৌলিক সনদ হিসাবে কাজ করবে।

সাদ্দাম হোসেন

বিপ্লবী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান

ইরাকী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট

বাগদাদ, ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৮০

সমাপ্ত